পরিবেশ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের পর্যালোচনা (১৯৪৭-২০১১)

এম. ফিল. (ইতিহাস) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণাপত্রের অভিসন্দর্ভ

অলোক কোরা

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষাবর্ষ: ২০১৭ – ২০১৯

ক্রমিক সংখ্যা: ০০১৭০০৬০৩০১৭

নিবন্ধন সংখ্যা: ১০৬৫৪৪ (২০০৮-২০০৯)

তত্ত্বাবধায়ক

ড. শুভাশিস বিশ্বাস

অধ্যাপক

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

Certified that the thesis entitled পরিবেশে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের পর্যালোচনা (১৯৪৭-২০১১) submitted by me towards the partial fulfillment of the degree of Master of Philosophy (Arts) in History of Jadavpur University, is based upon my own original work and there is no plagiarism. This is also to certify that the work has not been submitted by me for the award of my other degree/diploma of the same Institution where the work is carried out, or to any other Institution. A Paper out of this discretion has also been presented by me at a seminar / conference at ……..... thereby fulfilling the criteria for submission, as per the M.Phil Regulation (2017) of Jadavpur University.

(Aloke Kora, Roll No- 001700603017,
Registration. No- 106544 of 2008-2009)

On the basis of academic merit and satisfying all the criteria as declared above, the dissertation work of M.Phil dissertation entitled "পরিবেশে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের পর্যালোচনা (১৯৪৭-২০১১)" is now ready for submission towards the partial fulfillment of the degree of Master of Philosophy (Arts) in History, Jadavpur University

---	---	---
Head Department of History	Supervisor & Convener of RAC	Member of RAC

JADAVPUR UNIVERSITY
Kolkata- 700032

CERTIFICATE

This is to certify that the dissertation titled ***পরিবেশ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের পর্যালোচনা (১৯৪৭-২০১১)*** submitted by Aloke Kora in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Philosophy in History, Jadavpur University, Kolkata. The dissertation is his original work and has not been previously submitted to Jadavpur University or any other university for any diploma or degree.

We recommend that this dissertation may be placed before the examiners for evaluation.

.....	.....
Professor Rup Kumar Barman	Professor Subhasis Biswas
Head, Department of History	Supervisor

JADAVPUR UNIVERSITY
Kolkata- 700032
2019

DECLARATION

I, ALOKE KORA, Class Roll No: - 001700603017; Examination Roll No: - MPHS194017; Registration No: - 106544 of 2008-2009, do hereby declare that the dissertation entitled "পরিবেশের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের পর্যালোচনাঃ ১৯৪৭-২০১১" has been prepared entirely by me under the guidance of Dr. Subhasis Biswas, Professor, Department of History, Jadavpur University, Kolkata- 700032.

I hereby declare that this work is original and has not been submitted in part or full to any other Universities or Institute for the award of any Degree or Diploma

---

Aloke Kora

JADAVPUR UNIVERSITY
Kolkata- 700032
2019

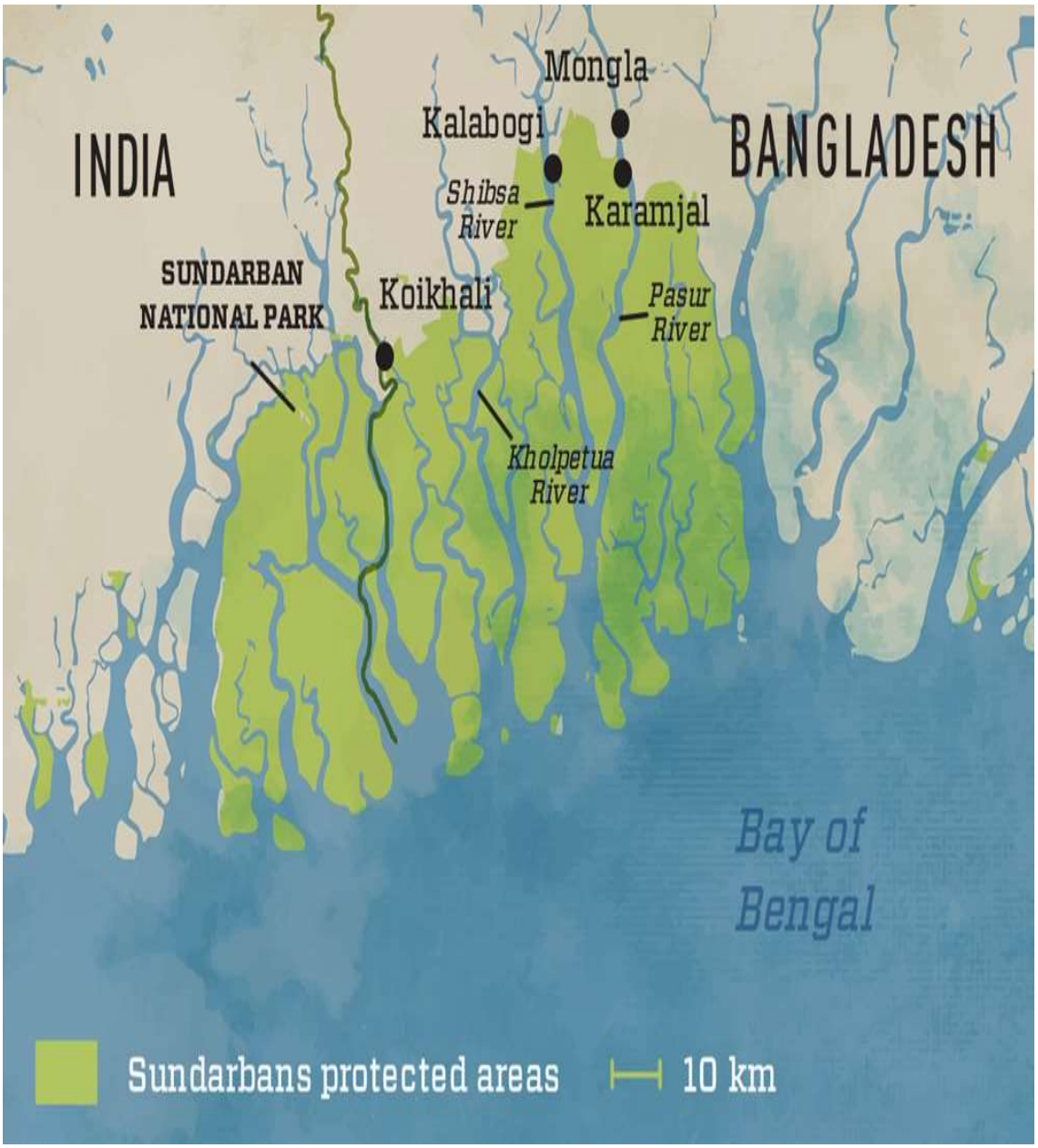
Mongla
Kalabogi
INDIA
BANGLADESH
Shibsa River
Karamjal
SUNDARBAN NATIONAL PARK
Koikhali
Pasur River
Kholpetua River
Bay of Bengal
Sundarbans protected areas
10 km

প্রাপ্তি স্বীকার

বর্তমানে পরিবেশ সঙ্কটের মূহুর্তে পরিবেশ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের ইতিহাস -- বিষয়টি নির্বাচন করেছি গবেষণার জন্য। সুনির্দিষ্ট বিষয় হিসাবে পরিবেশ ইতিহাসের প্রেক্ষিতে সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্র সংক্রান্ত আঞ্চলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ খুবই কম চোখে পড়ে। তথ্যের বিচারেই আলোচ্য বিষয়টিকে গবেষণার জন্য বেছে নিয়েছি। তাছাড়া সুন্দরবন জন্মভূমি হওয়ার সুবাদে ছোটো থেকেই সুন্দরবনের নদী, মাঠ, রাস্তা, ঘাট প্রভৃতি সমস্ত কিছুকে দেখে আসছি। এবং এই বাস্তুতন্ত্রের দ্বারা সুন্দরবনের সমস্ত কিছু কিভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে সেটা সামনে থেকে প্রত্যক্ষ করতে পেরেছি। ফলে এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানার আগ্রহ হওয়াটা স্বাভাবিক। তাই উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পাওয়া মাত্র বিষয়টিকে গবেষণার জন্য নির্বাচন করি।

এই অল্প সময়ে সুন্দরবনের মত বিশাল এলাকার বাস্তুতন্ত্র এবং বাস্তুতন্ত্রকেন্দ্রিক বিভিন্ন ধরণের বিবর্তন ও সমস্যার যে দিক তুলে ধরার চেষ্টা করেছি তা সম্ভব হয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের মাননীয় অধ্যাপক প্রফেসার শুভাশিস বিশ্বাসের ঐকান্তিক সহযোগিতায়। ওনার সহযোগিতা, সুপরামর্শ, উৎসাহ এবং সমর্থন ছাড়া আমার এই গবেষণা সম্পূর্ণ করতে পারতাম না। তাই আমি আমার শিক্ষক ও আমার তত্ত্বাবধায়ক সম্মানীয় প্রফেসার শুভাশিস বিশ্বাস মহাশয়ের সহযোগিতা এবং আন্তরিকতার জন্য আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা এবং শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের মাননীয় অধ্যাপক, অধ্যাপিকাদের সাথে শ্রেণীকক্ষে ও শ্রেণীকক্ষের বাইরে নানা আলোচনা ও পরামর্শের দ্বারাও নানা ভাবে উপকৃত হয়েছি। বিশেষ করে মাননীয়া প্রফেসার মহুয়া সরকারের প্রতিনিয়ত উৎসাহদান ও সুপরামর্শ আমার এই গবেষণাকে আরও

সহজ করে দিয়েছে। তাই আমি সকলের কাছে কৃতজ্ঞ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের গ্রন্থাগার, জাতীয় গ্রন্থাগার, ক্যানিং পাবলিক লাইব্রেরী, ক্যানিং বসন্তসেন লাইব্রেরী, বিদ্যানগর জেলা লাইব্রেরী এই সমস্ত লাইব্রেরীকে আমি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বিশেষ করে ক্যানিং বসন্তসেন লাইব্রেরীকে। এই সমস্ত লাইব্রেরী থেকে সাহায্য না পেলে এই গবেষণা এতটা সহজ ভাবে সম্পন্ন করতে পারতাম না। আমার গবেষণা সম্পূর্ণ করার জন্য প্রত্যক্ষ ভাবে সহযোগিতা করেছেন মাননীয় শ্রী সুদীপ্ত সরকার মাহাশয়। তাছাড়া আমার নিকটস্থ বন্ধু ও আমার বিভাগীয় দাদা দিদিরা নানা ভাবে সাহায্য করেছে। আমি আমার বন্ধু ও বিভাগীয় দাদা, দিদি, ভাই, বোনদের কাছ থেকে প্রতিনিয়ত লেখার জন্য অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা পেয়েছি। বিশেষ করে মৃন্ময় ভারতী, প্রিয়াঙ্কা গুহ রায়, পূজা ব্যানার্জী, শুভঙ্কর দে, শুভদীপ দাস, সোমা নস্কর, পার্থ মণ্ডল, বিশ্বস্তি ভট্টাচার্য, সোহিনী দাস। এছাড়া আমার বান্ধবী ব্রততী পালের কাছে আমি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। সাথে সাথে আমার অন্যান্য সমস্ত শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রতি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। এবং সমস্ত সুন্দরবনবাসীর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। ক্ষেত্রসমিক্ষার সময় তাদের অমূল্য বক্তব্য আমার গবেষণার পথকে অনেকটা সহজ করেছে।

সর্বোপরি যাঁদের জন্য আমি প্রথম এই পৃথিবীর আলো দেখেছি আমার সেই শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় পিতা শ্রী শ্রীধর চন্দ্র কোরা এবং মাতা শতদল কোরা, তাঁদের চরণে শতকোটি প্রণাম। মায়ের অফুরন্ত ভালোবাসা আমার গবেষণার পথে এগিয়ে যেতে অনেক ভাবে সাহায্য করেছে। যা আমার জীবনের প্রধান পাথেয় ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে যাওয়ার। আমার দাদা শ্রী অসীম কোরা সব সময় আমার পাশে থাকার জন্য তাকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাই। আমার পরিবার আমার পাশে না থাকলে আমি কখনও এই কাজ সম্পূর্ণ করতে পারতাম না। তাই আবারও সকলকে শ্রদ্ধা, প্রণাম জানিয়ে শেষ করলাম।

অলোক কোরা
ইতিহাস বিভাগ, এম.ফিল
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সূচিপত্র

ভূমিকাঃ 01-04

প্রথম অধ্যায়ঃ সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের ইতিহাস 05-66

ক) সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

খ) সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের ক্রমবিবর্তনের ধারা

গ) সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের প্রেক্ষাপটে সুন্দরবনের অরণ্য আইন

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্র ও সুন্দরবনবাসীর উপরে তার প্রভাব 67-90

ক) সুন্দরবন ও সুন্দরবনবাসীর মধ্যে সম্পর্ক

খ) সুন্দরবনবাসীর দৈনন্দিন জীবন প্রণালীতে গভীর বাস্তুতন্ত্রের প্রভাব

গ) সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের প্রতি সরকারী দৃষ্টিভঙ্গি ও সুন্দরবনবাসী

তৃতীয় অধ্যায়ঃ সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্র ও তার ভবিষ্যৎ 91-134

ক) সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্র কেন্দ্রিক পর্যটন শিল্প

খ) সুন্দরবনের ইতিহাসে গভীর বাস্তুতন্ত্রের অবদান

গ) সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্র কেন্দ্রিক বিভিন্ন ধরণের সমস্যার পর্যালোচনা

উপসংহার 135-141

গ্রন্থপঞ্জীঃ 142-159

পরিশিষ্টঃ 160-167

ভূমিকা

পৃথিবীতে বসবাসকারী প্রতিটি প্রাণী স্বতন্ত্র এবং পরিবেশের বাস্তুতন্ত্রে কিছু না কিছু কার্যকরী ভূমিকা বহন করে চলেছে। বাস্তুতন্ত্রের মধ্যবর্তী এই ভুমিকা বা পারস্পরিক মূল্য নির্ধারণের বিষয়টি Intrinsic value বা স্বকীয় মান বলে অভিহিত করা হয়। প্রতিটি প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যেকার এই মূল্য তাদের নিজস্ব জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করে। এই ধারা পর্যায়ক্রমিক ভাবে চলতে থাকলেও কিছু ক্ষেত্রে ভারসাম্যের প্রশ্নে সমস্যা তৈরি করে। পরিবেশের এই ভারসাম্য বিভিন্ন প্রাণী বা উদ্ভিদের উপর ভীষণ ভাবে নির্ভরশীল। বিষয়টি এতটাই সংবেদনশীল যে কোন একটি দিকের অসামঞ্জস্য হয়ে পড়া সমগ্র বাস্তুতন্ত্রের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলতে পারে। এই জায়গাতে 'গভীর বাস্তুতন্ত্র' প্রচণ্ড ভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। পৃথিবীতে প্রাণের ভারসাম্য তখনই বজায় থাকবে যখন জন্ম-মৃত্যু মধ্যেকার শৃঙ্খলার মধ্যবর্তী ভারসাম্য বজায় থাকবে। বস্তুত বলা যায় গভীর বাস্তুতন্ত্র হল এমন একটি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান জনিত দর্শন যা মানব জাতির যান্ত্রিক উপযোগের ঊর্ধ্বে উঠে সামগ্রিক প্রাণী জগতের সহজাত ধর্মকে উপস্থাপন করে। এই তত্ত্বটিকে সরলীকৃত করলে বলা যায় জগতে প্রাণের বিনাশ না ঘটলে নতুন প্রাণের সৃষ্টি সম্ভব নয়, আবার একথাও সত্য যে প্রাণীর বা প্রাণের জন্মের মধ্যে তার মৃত্যুর বীজ লুকিয়ে রয়েছে।

এই গভীর বাস্তুতন্ত্রের প্রবক্তা নরওয়ের দার্শনিক আর্নে নায়েস। তাঁর এই তত্ত্বের অপর ভিত্তি করেই বলা যায়, প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে গভীর বাস্তুতন্ত্রের মূল নীতি বিবর্তিত হয়েছে। এই তত্ত্বানুসারে প্রাকৃতিক জগৎ হল একটি সূক্ষ্ম ভারসাম্য যা জটিল আন্তঃসম্পর্ককে বুঝতে সাহায্য করে। মানব জগৎও প্রাকৃতিক শক্তির অপব্যবহার শুধুমাত্র মানুষ নয় বরং প্রত্যেকটি প্রাণীই যারা এই প্রকৃতির বাস্তুতন্ত্রে উপস্থিত তাদেরকে এক গভীর সংকটময় পরিস্থিতির সম্মুখীন করতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য গভীর বাস্তুতন্ত্র অনুযায়ী বলা যেতে পারে যে জীবিত প্রত্যেকটি প্রাণী এবং তাদের পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি সমানভাবে বৃধির অধিকারী।

এই বাস্তুতন্ত্রের মতানুযায়ী ভূমি জগতের প্রাকৃতিক বস্তু কোনোভাবেই মানুষের কাজে লাগানোর জন্য নয়। যে কোন অংশের উপস্থিতি সম্পূর্ণরূপে তার নিজস্ব এবং বলাই বাহুল্য তা উভয় পক্ষ্যেই একে-অপরের প্রতি নির্ভরশীল। বলা যেতে পারে এই তত্ত্বের মধ্য দিয়ে বাস্তুতন্ত্রে মানব জগতের প্রাধান্যকে এড়িয়ে প্রত্যেকটি সজীব ও নির্জীব পক্ষের সমান অধিকার ও অস্তিত্বের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

বর্তমান যুগে পৃথিবীর বুকে অন্যতম মূল সমস্যা হল বাস্তুতন্ত্র সংক্রান্ত সমস্যা। মূলত বলা চলে নিজ বাস্তুতন্ত্র সংক্রান্ত ঐতিহ্যগত জ্ঞান, মূল্যবোধ এবং নীতিগত অভাব এই সমস্যাকে আরও বড় করে তুলেছে। এই সমস্যার মূল বীজ মানব জাতির চিন্তাধারার মধ্যে নিহীত। এবং এই চিন্তাধারার মূল বিষয়বস্তু হল অন্যান্য প্রাণীজগৎ বা অন্যান্য প্রাকৃতিক বিষয় গুলির ওপরে মানবজাতির অধিকার স্থাপনের এক উগ্র ও নৃশংস অভিপ্রায়।

ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গের বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সুন্দরবন অঞ্চল। সুন্দরবনকে ঘিরেই রচিত হয়েছে বহু ইতিহাস তার মধ্যে অন্যতম হল সুন্দরবনের ক্ষেত্রে মানুষের অযাচিত হস্তক্ষেপ তার পরিবেশের ভারসাম্য কতটা পরিবর্তিত করেছে তা নিয়ে। এই আলোচনার সঠিক বিশ্লেষণ শুধুমাত্র গভীর বাস্তুতন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে করলে তবেই তা পূর্ণতা লাভ করবে। শুধু বনের অতীত ইতিহাস থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত যে বিবর্তন ইতিহাসের পাতায় লক্ষ্য করা যায় তা, গভীর বাস্তুতন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

রাষ্ট্রীয় ব্যবচ্ছেদে সুন্দরবনের এলাকা খর্বাকৃত হয়ে বর্তমানের যে সীমানায় এসে দাঁড়িয়েছে তার আয়তন ৯৬৩০ বর্গ কিলোমিটার। ২০০১ সালে এক সমৃদ্ধ বাস্তুতন্ত্রের সম্মান লাভ করে সুন্দরবন। নদ-নদী, উদ্ভিদ-প্রানী, ও মানুষ নিয়েই সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্র। প্রত্যেকের মধ্যে রয়েছে আন্তঃসম্পর্কের শৃঙ্খলা। নিম্ন লিখিত বেশ কয়েকটি তথ্য ডীপ ইকোলজী সম্পর্কিত ধারণার কথা বলে। যেমন-Arne Naess, Ecology, Community and Lifestyle; Richared Sylvan, A Critique of Deep Ecology; Ariel Kay Salleh, Deeper than Deep Ecology: The Eco-Feminist Connection; David Pepper, Eco-socialism from Deep Ecology to Social justice; Murray Bookchin, Social Ecology versus Deep Ecology: A Challenge for

the Ecology Movement; Bill Devall, Simple in Means, Rich in Ends: Practicing Deep Ecology, Arne naess, The Basics of Deep Ecology, Alan Drengson, Deep Ecology Movement, Arne Naess, The Shallow and the Deep, Long-Rang Ecology Movement. A summary; Elizabeth A. Bragg, Towards Ecological Self, Deep Ecology Meets Constructionist Self-Theory.

গভীর বাস্ততন্ত্র ও জীবন আদিবাসী ও অ-আদিবাসী পৃথিবীর পার্থিব জীবন ও গভীর বাস্তুতন্ত্র একই সঙ্গে নিজস্ব দোটানায় জড়িত। গভীর বাস্তুতন্ত্রের সংজ্ঞা নির্ণয় কঠিন। কারণ তা অসঙ্গায়িত। ডীপ ইকোলজী যখন প্রথম রামচন্দ্র গুহ (Deep Ecology, page-35) সুস্পষ্টভাবে ঐতিহাসিক পর্যালোচনা করে তখন তার বিশ্লেষণে Ecology শব্দটা অধিক ছিল Deep Ecology র তুলনায়। ঘটনাক্রমে একজন তাত্ত্বিক পরিবেশবাদী হিসেবে পরবর্তীকালে Ecology র পর্যালোচনায় তিনি মন্দ্রিত হন। বিদেশী ঐতিহাসিকেরা অনেকেই বিশেষত আফ্রিকার প্রশ্নে Deep Ecology র তত্ত্বে মন্দ্রিত হন।

ইতিহাস বিশেষত Deep Ecology র ইতিহাস সার্বজনীন কিন্তু সার্ব-গ্রহণযোগ্য নয়। আমার এই ছোট ঐতিহাসিক সনদের বক্তব্য সেই বৈধতাকে তুলে ধরা ও উদ্দেশ্য এর সামগ্রিক চরিত্রকে ক্ষুদ্র অর্থেও সংজ্ঞাপিত করা। এই থিসিসে সংকল্প বিধান ও সংজ্ঞা সেই উদ্দেশ্যে।

সুন্দরবনকেন্দ্রিক গভীর বাস্তুতন্ত্রের পর্যালোচনার সুবিধার্থে আমার গবেষণা সন্দর্ভকে তিনটি অধ্যায়ে বিন্যাস ঘটিয়ে সঠিক বিশ্লেষণে মন্দ্রিত হয়েছি। প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের ইতিহাস, যেখানে সুন্দরবনের অংশীদারি ম্যানগ্রোভ অরণ্যের ধারাবাহিকতা। অর্থকরী দিক দিয়ে এবং ভেষজগুণে ম্যানগ্রোভের সমৃদ্ধি, তাছাড়া মানব সমাজের আইনে তার বিপন্নতার ও বিলুপ্তির ইতিহাস রচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে গভীর বাস্তুতন্ত্র সহ সুন্দরবনবাসীর সহাবস্থান। যেখানে গভীর বাস্তুতন্ত্রের অংশ হিসাবে নদী ও অরণ্যকে কেন্দ্র করে সুন্দরবনবাসীর ভাঙ্গা-গড়ার বিচ্ছিন্ন এক জীবন কাহিনী। সাম্প্রতিক সময় ব্যতীত কোনো গ্রহনযোগ্য উন্নয়ন সেখানে পৌঁছায়নি। গবেষণা সন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়ে চিত্রিত হয়েছে গভীর বাস্তুতন্ত্রের ভবিষ্যৎ। সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রকে ঘিরে যে পর্যটন কেন্দ্র তার ঐতিহ্যকে তুলে ধরার চেষ্টা

করে, বিশৃঙ্খল জনবিস্ফোরণ গভীর বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যকে ক্রমাগত সমস্যায় জড়িয়ে ধরেছে। মানুষের অবস্থান যেহেতু এই বাস্তুতন্ত্রকে বিপন্ন করে তুলেছে তাই মানুষের সমস্যার সমাধানই হবে সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখার একটা ইতিবাচক পদক্ষেপ।

আমার এই গবেষণা পত্রের মধ্য দিয়ে সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রকে কেন্দ্র করে যে প্রশ্ন-উত্তর গুলি খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেছি তা হল- সুন্দরবন আদৌ কি Deep Ecology র মূল মন্ত্রকে মেনে চলেছে? সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রকে নিয়ে সরকার ও সুন্দরবনবাসী সত্যিই কি যত্নশীল? গভীর বাস্তুতন্ত্রকে ঘিরে সুন্দরবন ঐ ধারায় কি পৌঁছতে পারেনি? এই প্রশ্ন গুলোকে ঘিরেই গবেষণা সন্দর্ভকে সঠিকভাবে বিশ্লেষিত করার চেষ্টা করেছি।

প্রথম অধ্যায়

সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের ইতিহাস

ডাঙ্গায় বাঘ আর জলে কুমির এই সত্যতা নিয়ে সুন্দরবন। বঙ্গদেশের দক্ষিণ সীমায় অবস্থিত সমুদ্র কূলবর্তী জঙ্গলাকীর্ণ ভূভাগকে সুন্দরবন বলে অভিহিত করা হয়। ‘‘নিম্নবঙ্গে যেখানে গঙ্গা বহু শাখা বিস্তার করিয়া, সাগরে আত্মবিসর্জন করিয়াছেন, প্রাচীন সমতটের দক্ষিণাংশে অবস্থিত সেই লবণাক্ত পল্বলময় অসংখ্য বৃক্ষগুল্ম সমাচ্ছাদিত শ্বাপদসঙ্কুল চরভাগ সুন্দরবন বলিয়া পরিকীর্ত্তীত হয়’’[১]

উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার উন্নয়নশীল ৬ ও ১৩ টি ব্লকের বাদাবন ও লোকালয় নিয়ে ৯৬৩০ বর্গ কিলোমিটার সুন্দরবন অঞ্চল। এর ৪২৬৭ বর্গ কিলোমিটার শুধুই বন ও ১৯৬৭ বর্গ কিলোমিটার নদ-নদী, নদীর চর বা ঢাল[২]। অর্থাৎ সুন্দরবন নদীনালায় সমৃদ্ধ। নদী গুলি সুন্দর বনের উত্তর থেকে দক্ষিণে বয়ে গেছে। প্রধান নদী গুলি হল হুগলী, বারাতলা, সপ্তমুখী, গোসাবা, ঠাকুরান, হেড়ভাঙ্গা, রায়মঙ্গল, ইচ্ছামতী, বিদ্যা, মাতলা। অধিকাংশ নদী গুলিই নোনা জলে পূর্ণ। ভারতীয় সুন্দরবনের মোট ১০২ টি অরণ্যময় দ্বীপের যে ৫৪ টি দ্বীপে জঙ্গল হাসিল করে মনুষ্য বসতি স্থাপন করা হয়েছে সেই সব দ্বীপের চারপাশে মাটি দিয়ে বাঁধ নির্মাণ করে নদীর জল আটকাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুন্দরবন এক ফসলি। বর্ষার জলেই মূলত চাষবাস হয়। আমার গবেষণার ক্ষেত্র ভারতীয় সুন্দরবনের ডীপ ইকোলজি বা গভীর বাস্তুতন্ত্রের ঐতিহাসিক এক পর্যালোচনা।

আমার গবেষণার ক্ষেত্র ভারতীয় সুন্দরবন যার পশ্চিমে হুগলী নদীর মোহনা, পূর্বে ইচ্ছামতী-কালিন্দী-রায়মঙ্গল, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং উত্তরে ড্যাম্পিয়ার হজেস লাইন। এর মধ্যেকার গভীর বাস্তুতন্ত্রের এক ঐতিহাসিক পর্যালোচনা। এই বাস্তুতন্ত্র কেবলমাত্র একটা শৃঙ্খলা নয়, শৃঙ্খলার মধ্যে থেকে একে অপরের মধ্যেকার আত্মসম্পর্কের সত্যানুসন্ধান। সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের যে ইতিহাস অনুসন্ধানে নিমজ্জিত হয়েছি তাতে নদ-নদী, বনাঞ্চলের উদ্ভিদ, বন্যপ্রাণী, বনজ সম্পদ ও সামুদ্রিক সম্পদ এবং অবশ্যই মনুষ্য সম্পদ এর সঙ্গে সংযুক্ত।

সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের গবেষণা তখনই সম্ভব যখন আমরা সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্র কেন্দ্রিক বা বাস্তুতন্ত্রের অঙ্গীভূত সমস্ত কিছুর পর্যালোচনা করতে পারবে। সুন্দরবনের অরণ্য প্রকৃতি কালের স্বাভাবিক নিয়মেই গড়ে উঠেছে। বাস্তুতন্ত্র বলতে যা বোঝায় তা হল সমস্ত উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলের বেঁচে থাকার জন্য অনুকুল এক পরিমণ্ডল। সুন্দরবনের এই বাস্তুতান্ত্রিক পরিমণ্ডল মানুষের দ্বারা সৃষ্ট নয়, প্রকৃতির আপন খেয়ালে সৃষ্ট।

পৃথিবীর বৃহত্তম ও বিস্ময়কর লবণাম্বু উদ্ভিদ বা ম্যানগ্রোভ বৃক্ষের বনভূমি সুন্দরবন। সুন্দরবন সংরক্ষিত বনাঞ্চল বিশ্বস্বীকৃত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বাস্তুতন্ত্র, যেখানে রয়েছে নানান জীব-বৈচিত্র্যের সমাহার। তাছাড়া হাজারো সব উদ্ভিদ সম্পদের প্রাচুর্য যা শতাব্দীকাল ধরে সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত।

সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরনঃ

সুন্দরবন অরণ্যে ৮৬ প্রজাতির ম্যানগ্রোভ বৃক্ষ পাওয়া যায়। সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের উল্লেখযোগ্য ম্যানগ্রোভ বৃক্ষ গুলি হল- সুন্দরী (Heritiera minor), গর্জন (Raizophora sp),

ধুঁদুল (Xylocarpusgranatum), পশুর (Xylocarpusmekongenesis), কেওড়া (Sonneratia apetala), মট-গরান (Ceriops tagal), তড়া (Aegialitis rotundicauda), গড়িয়া (Kandelia candel), ভোরা (Rhizophora apiculata),বাইন (Avicennia officinalis), গরান (Ceriops decandra), হেঁতাল (Phoenix paludosa), গৌর শিঙ্গে (Dolichandrone spathacea), গোলপাতা (Nipa fruticans), কাঁকড়া (Bruguiera sp), জেলে-গরান (Ceriops decandra), হারজোলা (Acanthus illicifolius), গেঁও (Excoecaria agallocha), গোরি (Kandelia rheeii), কাওরা (Bruguiera gymnorhiza), বাতরাজ (Clerodendrum sp), ওরা (Sonneratia acida) প্রধান[৩]।

তাছাড়া আরো কিছু ম্যানগ্রোভ বৃক্ষের অবস্থান ও পরিলক্ষিত হয় সুন্দরবনে। সেগুলি হল- আমুর, তরা, হিজল, সমুদ্র, খলসি, বাবলা, গামিরাই, ভোলা, হিজলিমেনাদি, করঞ্জা, কেদারসুন্দরি, লতাসুন্দরি, বন কার্পাস, বন ভেন্ডি, ঝাউ, দুধিলতা, বাওলি লতা, চুলিয়া কাঁটা, বনক্যান, বনসীম, বড়সীম, কেয়া, পানলতা, সিঙ্গার, ডাবুর, কুরচি, দাদামারি, চায়া, প্রভৃতি গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদের অস্তিত্বের প্রমান পাওয়া যায় সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রে।

সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রকে কেন্দ্র করে নিম্নলিখিত নোনাজলের উপযোগী ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ বা বৃক্ষ গুলি যেমন সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের সম্পদ তেমনিভাবে এই ম্যানগ্রোভ আবার মনুষ্য প্রজাতিরও সম্পদ। নিম্ন লিখিত কয়েকটি ম্যানগ্রোভ বৃক্ষের সার্বিক বিশ্লেষণ তার যৌক্তিকতা বিচার করবে।

সুন্দরীঃ- স্টারকুলেয়েসি গোত্রের এই উদ্ভিদ গ্রীষ্মমন্ডলীয় জোয়ার-ভাঁটার অরণ্যে পাওয়া যায়। সুন্দরবনের নামের সঙ্গে এর সার্থকতা রয়েছে। সুদূর অতীতে কলকাতা নগরীতেও সুন্দরী বৃক্ষের

বন ছিল। সুন্দরী কাঠ খুবই দৃঢ় ও মজবুত হওয়ায় খুবই উপযোগী সাপেক্ষ, পোকার আক্রমন রোধের ক্ষমতা রাখে। সুন্দরী ফুলের মধু উৎকৃষ্ট। মানুষের ব্যাপক হস্তক্ষেপে সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্র থেকে সে আজ বিলুপ্তির পথে।

গরানঃ- সেরিওপস ট্যাগাল প্রজাতির চিরহরিৎ বৃক্ষ। প্রকৃতই ম্যানগ্রোভ। একে জাত গরান বা মটগরান বলা হয়। সুন্দরবনের অরণ্যে এই বৃক্ষ এমনভাবে নিজেকে সজ্জিত করে রাখে যে দূর থেকে একে পিরামিডের মতো দেখায়। ৬-৭ মিটার এই বৃক্ষের উচ্চতা। প্রচুর পরিমানে লবণ সহ্যক্ষম গরান সুন্দরবনের জঙ্গলের ৫ শতাংশ জায়গা দখল করে আছে। এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব এতো বেশি যে মানুষের লালসার কুঠার এর ওপর প্রচন্ড আঘাত হানে। পরিনত একটা গরান বৃক্ষ হালকা লাল বর্ণের হয়। প্রস্ফুটিত হবার সময় গরান ফুলের হালকা ও সুমিষ্ট গন্ধ মৌমাছি ও পতঙ্গ কে কাছে টানে। গরান ফুলের মধু উৎকৃষ্ট। তাছাড়া বাসগৃহ নির্মাণ, নদীর বাঁধ নির্মাণ সহ নানান গৃহস্থালির কাজে এর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। কান্ডের রস বা ছালের রস ট্যানিনের জন্য, এবং চর্ম ও অন্যান্য শিল্পে ব্যবহৃত হয়। রক্তবন্ধ ম্যালিগন্যান্ট ঘা নিরাময় সহ ভেষজ বিজ্ঞানে গরান খুবই সমাদৃত।

গেঁওয়াঃ- ইউফরবিয়েসি গোত্রের উদ্ভিদ গেঁও বা গেঁওয়া এক্সোকারিয়া অ্যাগালোচা প্রজাতির। ম্যানগ্রোভ সহবাসী এই উদ্ভিদ চিরহরিৎ, লম্বায় ১৫ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। স্ত্রী ও পুরুষ বৃক্ষ আলাদা আলাদা। দক্ষিন পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দ্বীপপুঞ্জে এই উদ্ভিদটিকে দেখা যায়। এই গাছের পত্র জ্বালানী, আসবাবপত্র, কাগজের মন্ড ও প্যাকিং বাক্সের কাজে খুবই উপযোগী। ভূমিক্ষয় রোধ এবং দ্রুত অরণ্য সৃজনে সক্ষম এই ম্যানগ্রোভ ভেষজ বিজ্ঞানে যথেষ্ট সমাদৃত।

কেওড়াঃ- সোন্নারেসিয়েসি গোত্রের কেওড়া চিরহরিৎ। শ্বাসমূল যুক্ত এই ম্যানগ্রোভ বৃক্ষটি জোনাকিদের বড়ো প্রিয়। রাতের বেলায় এই গাছটিকে ঘিরে জোনাকিময় হয়ে থাকার জন্য বিজ্ঞানী গণ এর নাম দিয়েছেন ফায়ারফ্লাহ ম্যানগ্রোভ। বৃক্ষটি উচ্চতায় ১৫ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। কেওড়া ফুলের মধুর পরিচিত রয়েছে দেশ ও দেশান্তরে। নদীর জলে ভাসমান অবস্থায়ও কেওড়া জন্মাতে পারে। আসবাবপত্র, নৌকা নির্মাণ এ ব্যবহৃত হয় কেওড়া কাঠ। ভুমিক্ষয় রোধে বৃক্ষটির গুরুত্ব অপরিসীম। নোনা জলের মাছ বিশেষ করে চিংড়ির আদর্শ বিচরণভূমি হল কেওড়ার জঙ্গল।

বাইনঃ- গ্রীষ্মমন্ডলীয় জোয়ার-ভাঁটার অরণ্য উদ্ভিদ গোষ্ঠীর মধ্যে সুন্দরবনের বাইন আভিসিন্নিয়া অফিসিন্নালিস প্রজাতির। বাইন সুন্দরবনের জঙ্গলের প্রায় ৩০ শতাংশ জায়গা দখল করে থাকে। ২০-২৫ মিটার উচ্চতা সম্পন্ন বাইন বৃক্ষ চিরহরিৎ সম্প্রদায়ভুক্ত। বাইনের ফলের রস ফোঁড়া নিরাময়কারী ভেষজ ঔষধ হিসাবে গণ্য হয়। এই বৃক্ষের পাতা ও ছোট ছোট ডাল-পালা থেকে জৈবসার প্রস্তুত করা হয়। এর বায়বীয় শ্বাসমূলের গায়ে যে বিভিন্ন প্রজাতির শৈবাল জন্মে তাও চিংড়ি-সহ নোনাজলের মাছের খাদ্য সংগ্রহ ও বিচরণের পক্ষে অনুকূল। গৃহস্থালির কাজে বাইন উপযোগী।

গর্জনঃ- বাইজোফোরা এপিকুলেটা গোত্রের ম্যানগ্রোভ হল গর্জন। গর্জন সমগ্র ক্রান্তীয় বলয়ে জোয়ার-ভাঁটা খেলা অরণ্যের লবণাম্বু বৃক্ষ। এই গর্জন সুন্দরবনের অধিক লবণমুক্ত বদ্বীপ অঞ্চলের আদি উদ্ভিদ কুলের অন্যতম। এর বায়বীয় শ্বাসমূল ও অধিমূল জোয়ার-ভাঁটার তীব্র স্রোতেও ভুমিক্ষয় রোধে সক্ষম।

গর্জনের বাকল ট্যানিনের কাজে, বিভিন্ন বস্তু রং করতে বহুল পরিমানে ব্যবহৃত। তাছাড়া গর্জন জ্বালানী, কাঠ-কয়লা, গৃহস্থালির আসবাব, নৌকা নির্মাণের পক্ষে উপযোগী। পাতা ও ছোট ছোট প্রশাখা জৈবসার সৃষ্টির সহায়ক।

ধুঁদুলঃ- জাইলোকার্পাস গ্রানাটাম প্রজাতির ধুঁদুল চিরহরিৎ। ২০-২৫ মিটার উচ্চ। দেখতে কাঁঠাল গাছের মতো, অধিমূল আছে। ধুঁদুলের ফল গোলাকার অনেকটা তরমুজের মতো। জলে ভাসমান অবস্থায়ও ধুঁদুল বীজের অঙ্কুরোদগম হতে পারে। ট্যানিনের কাজেও এর বাকল ব্যবহৃত হয়। ভেষজ বিজ্ঞানীরা রক্তক্ষরন বন্ধে, উদরাময় অসুখে ধুঁদুল ম্যানগ্রোভ ব্যবহারের উপদেশ দেন।

পশুরঃ- জাইলোকার্পাস মেকনজেনসিস প্রজাতির পশুর সুন্দরবনের অতি পরিচিত বৃক্ষ। জোয়ার-ভাঁটা প্লাবিত কিছুটা সমতলভূমিতে পশুর ভালো জন্মায়। পশুর পর্ণমোচী বৃক্ষের অন্তর্গত। নদীর জলে ভাসতে ভাসতে পশুর বৃক্ষের বীজের অঙ্কুরোদগম হয়। পরিনত বৃক্ষ কাঁঠাল গাছের মতো দেখতে। আসবাবপত্র তৈরী, নৌকা তৈরী ও গৃহস্থালির নানা কাজে পশুর মূল্যবান কাঠ হিসাবে পশুর সমাদৃত।

গোলপাতাঃ- প্রকৃতই ম্যানগ্রোভ সহবাসী অ্যারিকেসি বা পামি গোত্রীয় এই উদ্ভিদ সুন্দরবনের জোয়ার-ভাঁটার অরণ্যে এর অবস্থান পরিলক্ষিত হয়। গোলপাতা ম্যানগ্রোভ পাম প্রজাতির নারকেল গাছের মতো দেখতে। গাঢ় লবণাক্ত জলে গোলপাতা জন্মাতে পারে না। গোলপাতা ঘা ও চুলকানিতে বিশেষ উপকারি।

হেঁতালঃ- প্রকৃত ম্যানগ্রোভ সহকারী হেঁতাল বোগড়া নামে সুন্দরবনবাসির কাছে পরিচিত। সুন্দরবনের লবণমুক্ত পরিনত শক্ত মাটিতে হেঁতাল ভালো জন্মায়। ফোনিক্স পালুডোজা বা পাম প্রজাতির হেঁতালের কান্ড ৩-৪ মিটার লম্বা হয়। জঙ্গল বৃদ্ধি ও মাটির ক্ষয়রোধ সহায়ক হেঁতাল ঠাসাঠাসি ভাবে

জন্মায়। হেঁতালের বন বাঘ ও বিষাক্ত সাপের উপযুক্ত বাসস্থান। হেঁতাল ও গোলপাতার জঙ্গলে পরিনত মাটির স্তরে অসংখ্য ছিদ্র দেখা যায়, আসলে আথ্রপোড়া, শামুক ও বিভিন্ন কীটপতঙ্গ গর্ত করে বাসা বাঁধে। হেঁতাল ও গোলপাতা ম্যানগ্রোভ বনভূমির জৈবিক, প্রাকৃতিক উপকার সাধন করে, ভূমির পতন রোধ করে, তুমুল ঝড়ঝাপটা থেকে দক্ষিণবঙ্গকে অনেকাংশে সহায়তা দিচ্ছে। গভীর বাস্তুতন্ত্রের সম্পদ, সুন্দরবনের উল্লিক্ষিত এই সমস্ত ম্যানগ্রোভ[৪] কেবলমাত্র অর্থকরী দিক দিয়েই যে সমৃদ্ধ করছে তা নয়। এই সমস্ত বৃক্ষ বা গাছ গুলির জীবনধারন প্রক্রিয়াই প্রাণীকুলকে বাঁচিয়ে রেখে বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য জনিত এক শৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে।

অনস্বীকার্য, গাছ ধরিত্রীর নীলকণ্ঠ। একটি গাছ একটি প্রান। একটি গাছ পরিবেশের বা বাস্তুতন্ত্রের থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে এবং পরিবেশকে ফিরিয়ে দেয় বিশুদ্ধ অক্সিজেন। এই অক্সিজেনই প্রাণীকুলের তথা আমাদের প্রাণবায়ু। একটি পিপুল গাছের মাথা যদি ডালপালা সমেত ১৬২ ব্যাস মিটার হয়, তো, ঘন্টায় প্রতি ২২৫২ কিলোগ্রাম কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে ও ফেরত দেয় ১৭১২ কিলোগ্রাম অক্সিজেন। বস্তুতপক্ষে, ৫৮০ বর্গ মিটার চওড়া সবুজ বনবিথী বাতাসে জমে থাকা সালফার যৌগের ৭০ শতাংশ শুষে নেয় এবং পরিবেশের ধূলো, ধোঁয়া ও ক্ষতিকারক গ্যাস ও ধারণ করে। ২৩ হাজার কিলোমিটার অতিক্রমী গাড়ীর দূষণও শুষে নেয় একটি পরিণত ম্যানগ্রোভ বৃক্ষ। প্রাণীজগৎ না খেয়ে জীবনধারনে সক্ষম, কিন্তু অক্সিজেন বাদ দিয়ে ক্ষণমাত্রও নয়[৫]।

এখন প্রশ্ন হল, সুন্দরবনের এত উদ্ভিদ বৈচিত্র্য বা ম্যানগ্রোভ বৈচিত্র্য এল কোথা থেকে। কোথায় ছিল এ বন? তার উত্তর খুঁজতে হলে আমাদেরকে প্রকৃতির শাসনের উপর বা প্রকৃতির নিয়মের মধ্যে খুঁজতে হবে। সত্যতা এই যে প্রাচীন ভারতবর্ষে ১৩ টি মহাবনের কথা জানা যায়। তাদের

মধ্যে আঙ্গেরীয় বন (১) অন্যতম। বাকি বন গুলি যথাক্রমে- (২) প্রাচ্যবন, (৩) নৈমিষারন্য, (৪) পঞ্চনদবন, (৫) সৌরাষ্ট্রবন, (৬) অপরান্তক বন, (৭) বামনবন, (৮) দশার্ণকবন, (৯) কারুষবন, (১০) মহাকান্তার, (১১) দন্ডকারণ্য, (১২) কলিঙ্গ বন, (১৩) কালেসবন। মূলত আঙ্গেরীয় বন থেকে সুন্দরবনের সৃষ্টি বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। তাঁদের বক্তব্য, যে প্রায় ৭-৮ হাজার বছর আগে এক বিশাল অরণ্য বঙ্গোপসাগর উপকূল থেকে উত্তর পূর্ব অসমের ব্রহ্মনদ পর্যন্ত সম্প্রসারিত ছিল। বিশেষজ্ঞরা বলেন যে এই ভয়াল ভয়ঙ্কর নয়নাভিরাম সুন্দরবন আঙ্গেরীয় বনেরই অংশ[৬]।

পৃথিবীর সমস্ত জায়গায়, বিশেষত ক্রান্তীয় অঞ্চলে ম্যানগ্রোভ দেখা যায়। তবে বৈচিত্র্যে তারা এক এক দেশে এক এক রকম। যেমন পশ্চিম আফ্রিকা ও আমেরিকা মহাদেশের উপকূল অঞ্চল অপেক্ষা ভারতবর্ষ ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ম্যানগ্রোভের বৈচিত্র্য সবচেয়ে বেশি। পশ্চিম আফ্রিকা ও আমেরিকায় এ পর্যন্ত মোট ৬-৭ রকম প্রজাতির লবনাম্বুজ উদ্ভিদের সন্ধান পাওয়া গেছে। কিন্তু ভারতবর্ষ ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় পাওয়া গেছে ৬০/৬২ রকম লবনাম্বুজ উদ্ভিদ ও গুল্ম। তবে বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতায় ম্যানগ্রোভের মহিমা দেখা যায় বঙ্গোপসাগরের ব-দ্বীপ অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে, তাছাড়া মালাক্কা প্রণালী, বোনিয়, নিউগিনি, থাইল্যান্ড ইত্যাদি দেশের কিছু কিছু অঞ্চলে। এছাড়া আফ্রিকার পূর্বাঞ্চলে জাম্বেসি ও রুফিসি নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চলে রয়েছে বিশাল এলাকা জুড়ে ম্যানগ্রোভের সারি। ভারত ও বাংলাদেশের গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্রের ব-দ্বীপ এলাকায় রয়েছে পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম ম্যানগ্রোভের সারি। এসব ছাড়াও আছে ভারতবর্ষের দক্ষিনাঞ্চলে মহানদী, গোদাবরী এবং কৃষ্ণা নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চলে ম্যানগ্রোভের বন। আর প্রকৃতির এই বিচিত্র উদ্ভিদ জগৎ জন্ম নিয়েছে বেশির ভাগই উপকূল আশ্রিত অঞ্চলে।

কখনও বড় বড় নদীর মোহনা অঞ্চলে তাদের আবাস গড়ে উঠেছে, আবার কখনও তারা আবাস গড়ে তুলেছে বালিয়াড়ি ঢাকা অগভীর উপহ্রদ অঞ্চলে। এ সব অঞ্চলে সমুদ্রের নোনা জলের অবাধ যাতায়াতের জন্য এরা এসব জায়গা বেশি পছন্দ করে। আর পছন্দ করে অক্সিজেনের তুলনায় হাইড্রোজেন সালফাইড। তাই সমুদ্রের কাছাকাছি বালি মাটিতে এরা জন্মায় বেশি। কেননা এখানকার মাটিতে অক্সিজেনের তুলনায় হাইড্রোজেন সালফাইড-এর পরিমান থাকে বেশি। এছাড়া এ ধরনের মাটিতে প্রচুর হিউমাসও থাকে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ম্যানগ্রোভ অধ্যুষিত অঞ্চলের পরিমান ৬৮৭ হেক্টর। সুন্দরবন জীবমন্ডল সংরক্ষনের ১৯৮৯-৯০ থেকে ১৯৯৩-৯৪ এর হিসেব অনুযায়ী[৭]।

মোটামুটি ইতিহাস খুজলে দেখা যাবে, প্রাচীন কাল থেকে মানুষের কাছে গরান, বাইন, সুন্দরী, হোগলা, পশুর, ধুঁদুল, গোলপাতা, গর্জন ইত্যাদি সব ম্যানগ্রোভের পরিচয় ছিল। কেননা প্রাচীনকালে আরবদেশের নাবিকরা যে সব জাহাজ ব্যবহার করতো, জানা যায় যে সে সব জাহাজের মাস্তুল তৈরী হত সম্পূর্ণ একটা ম্যানগ্রোভের কান্ড থেকে। আবার ম্যানগ্রোভ কেটে ও তৈরী হত তক্তা। এবং তক্তা দিয়ে তৈরী হত জাহাজ। ২০০০-৩০০০ হাজার খ্রিষ্ট-পূর্বাব্দে বাহরিন থেকে যে সব জাহাজ ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে বানিজ্য করতে আসতো, সেই সব জাহাজের সামনের ও পেছনের অংশ তৈরী হত গরান, বাইন ইত্যাদি সব ম্যানগ্রোভের কাঠ বা তক্তা দিয়ে।

ম্যানগ্রোভের ব্যবহারিক দিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে গভীর বাস্তুতন্ত্রকে কেন্দ্র করে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভের ব্যবহার মানব সভ্যতার নানান দিকে পরিব্যপ্ত। অর্থনীতি, ভেষজ কাজে ছাড়াও দেখা গেছে মানুষের ক্ষুধা নিবৃত্তির কাজেও ম্যানগ্রোভের জনপ্রিয়তা রয়েছে।

এখন পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিনে তথা সুন্দরবনের ব-দ্বীপ এলাকায় কেওড়ার (ম্যানগ্রোভ প্রজাতি) ফল খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে ওই অঞ্চলের দরিদ্র মানুষেরা। আসলে, ম্যানগ্রোভের পরিচয়

মানেই পরিবেশের পরিচয়। পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার ব্যাপারেও ম্যানগ্রোভ এক বিরাট ভূমিকা নিয়েছে। উপকূল অঞ্চলে সমুদ্রের হাত থেকে ভুমিক্ষয় এড়াতে ম্যানগ্রোভ প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে থাকে। তাছাড়া আঞ্চলিক আবহাওয়ার নিয়ন্ত্রক এই প্রজাতির ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ।

ম্যানগ্রোভ ছাড়াও সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রে দেখা যায় বাবলা, আকাশমণি, সুবাবল, ইউক্যালিপটাস, ঝাউ, দেবদারু, চৌরাসিয়া, কেটকি প্রভৃতি বৃক্ষ। অবশ্য এগুলি ছাড়াও আরো নানান প্রকৃতির বৃক্ষ পরিবেশের সামাজিক বনসৃজন প্রকল্পের জন্য লাগানো হয়েছে। এগুলি রোপণ করার উদ্দেশ্য অবশ্য স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত ও পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা। তাছাড়া কোন স্থানের আবহাওয়া বন্যা বা খরা প্রভৃতির পরিবর্তনে অরণ্যের প্রভাব অপরিসীম। সেক্ষেত্রেও সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের পরিবেশ সংক্রান্ত ভারসাম্যও নিয়ন্ত্রিত হয় এই অরণ্যের দ্বারা। অরণ্য প্রকৃতির জলচক্র, কার্বন চক্র, নাইট্রোজেন চক্র, প্রভৃতি সচল রেখে জীবকুলের জীবন ধারনের প্রয়োজনীয় উপকরণগুলি সরবরাহ করে। সুন্দরবনের অরণ্য প্রকৃতি প্রচুর জল মাটি থেকে তুলে নিয়ে বা শোষণ করে পরিবেশে ছড়িয়ে দিয়ে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রন করে, বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরী করে।

বিখ্যাত পরিবেশ বিজ্ঞানী তথা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ তারকমোহন দাস একটি ৫০ টন ওজনের গাছ তার ৫০ বছরে জীবিতকালে পরিবেশ তথা মনুষ্য সমাজের যে উপকার করে, আর্থিক দিক থেকে তিনি তার মূল্যায়ন করেন, যেটি ১৯৭৯ সালে গবেষণামূলক প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়।

সেই মূল্যায়নটি নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

একটি গাছের মূল্যঃ

অক্সিজেন উৎপাদন	২,৫০,০০০ টাকা
পশু খাদ্য উৎপাদন	২০,০০০ টাকা
ভুমিক্ষয় রোধ ও মাটির উর্বরতা বজায় রাখা	২,৫০, ০০০ টাকা
চক্রাকারে জলের আবর্তন, বায়ুর তাপমাত্রা ও আদ্রতা নিয়ন্ত্রন	২,৫০,০০০ টাকা
প্রাণী ও অন্যান্য জীবের আশ্রয়স্থান	২,৫০, ০০০ টাকা
বায়ু ও তাপদূষণ(গ্রীনহাউস) নিবারন	৫০,০০০ টাকা
মোট-	১০,৭০,০০০ টাকা

সুত্রঃ- সুন্দরবন জীব-পরিমণ্ডল, সুধীন সেনগুপ্ত, পৃষ্ঠা- ৬৮

গভীর বাস্তুতন্ত্রের অংশ হিসাবে একটি গাছের মূল্য হিসাবে যে পরিসংখ্যান[৮] এখানে তুলে ধরা হয়েছে তাতে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে গভীর বাস্তুতন্ত্রের হাজার হাজার গাছ সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রে মানুষের বেঁচে থাকার জন্য কতটা উপকারি ও উপযোগী। ন্যাসি বেকহাম দেখানোর চেষ্টা করেন যে গলফ কোর্সের মতো একটা বড় ধরনের অরণ্য ৬ থেকে ৭ হাজার এর মতো মানুষের অক্সিজেনের যোগান দিয়ে পারে। এ থেকে বোঝা যায় যে ৪২৬৭ বর্গকিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্র প্রতিনিয়ত কি পরিমান অক্সিজেন উৎপাদন করছে তা সহজেই অনুমেয়।

দিন দিন সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্র নানা কারনে তার আয়তন হারাচ্ছে। ফলে অরণ্যের বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কত পরিমান কার্বন ডাই-অক্সাইড বাড়বে এবং তার কারণে তাপমাত্রা যে কতটা বাড়বে

তা অনুধাবন করা যায়। সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের ম্যানগ্রোভ অরন্য বার্ষিক ৪৬২ কোটি মূল্যের কার্বন শোষণ করে। বাৎসরিক ২৭৫ কোটি মূল্যের সাইক্লোন প্রতিহত করে[৯]। যে ম্যানগ্রোভ সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রকে এতো ভাবে সাহায্য করে, তবুও মানুষ সেই প্রাণদায়ী, অক্সিজেন দায়ী ম্যানগ্রোভ বৃক্ষ নির্মূল করে চলেছে। অরণ্য ও অরণ্যচারী এই সমস্ত সম্পদ কোনভাবেই পুনর্নবীকরন সম্ভব নয়। একবার যদি শেষ হয় তবে আর ফিরে আসবে না। ম্যানগ্রোভ লুপ্ত হলে মানুষও লুপ্ত হবে।

ম্যানগ্রোভ অরণ্যের মতো সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রকে ঘিরে প্রাণী বৈচিত্র্যও সুন্দরবনে অনন্য। ৩৩৪ প্রজাতির মনোরম বৃক্ষের বনভূমি আর নদী-নালা সমেত বিচিত্র সুন্দর ১৫৮৬ প্রজাতির প্রাণীকূলের সমাবেশ হল সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্র। সুন্দরবনের স্থলভাগে ২৮৬ টি প্রজাতির প্রাণী ও ২১৯ টি প্রজাতির জলজ প্রাণীর অস্তিত্বের কথা জানা যায়। এছাড়াও প্রায় ৩১৫ টি প্রজাতির পাখির কথা জানা যায়।

উল্লেখযোগ্য প্রাণীদের মধ্যে বাঘ (Tiger), চিতল হরিণ (Chital dear), বন্য শুয়োর (Wild boar), বিভিন্ন প্রজাতির বানর (Monkey), জংলি বিড়াল (Jungle cat), মেছো বিড়াল (Fishing cat), বাঁনর, বন বিড়াল, সজারু, কটাল, বেজি, কুমির, বিহঙ্গ প্রজাতির মধ্যে ধড়বক (Large and median egret), কোচে বক (Lettle egrat), পানকৌড়ি (cormorant), শ্বেত-সিন্ধু ঈগল (White bellied sea eagle), মেছো বাজ (Osprey), দৈত্য বক (Giant heron), পিনটেল (Pintaill), উইগন (Wigeon), টাফটেড পোচার্ড (teeffted pochard), কারলিউ (Carlew), হুইটব্রেল (Whitbrel), প্লডার, পোলিয়াথ হেরন (Goliath heron), প্রভৃতি সব উল্লেখযোগ্য পাখি।

সরীসৃপ প্রানীর মধ্যে ময়াল (Python), শঙ্খচূড় (King cobra), কেউটে (Cobra), কালাচ (Krait) সাপ অন্যতম। এছাড়া তার্কেল (Water monitor), সোনা গোসাপ (Yellow monitor), বাংলার গোসাপ (Bengal monitor), সমুদ্রের রিডলে কচ্ছপ (Ridloy's turtle), Green turtle, Hawksbill turtle, loggerhead turtle, নদীর মোহনার কুমীর (Estuarine crocodile), প্রভৃতি সব প্রাণীর দেখা পাওয়া যায়। তাছাড়া অমেরুদন্ডী প্রানীও প্রচুর যেমন গলদা চিংড়ি (Prawn), পাতাল চিংড়ি (Thaliacina sp), বেউলে কাঁকড়া (Fidler crab), লাল কাঁকড়া (Red crab), সাগর কাঁকড়া (Horseshoe crab), সমুদ্র শসা (Sea cucumber), গেছো শামুক (Troe smaoil), সাগর কুসুম (Sea anemone), তাছাড়াও বিভিন্ন প্রজাতির মৌমাছি (Honey bee) সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রকে প্রাণী সম্পদে বৈশিষ্টময় করেছে। মাছের মধ্যে হাঙ্গর, মাডস্কিপার, পারসে, ভাঙ্গর, ভেটকি, প্রায় ১২০ টি প্রজাতির মাছ ও অবস্থান করছে সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রে[১০]। বিশিষ্ট সুন্দরবন গবেষক কুমুদরঞ্জন নস্কর মনে করেন সুন্দরবনে বর্তমান বাঘ আছে বলে সুন্দরবনে বন আজও আছে। এবং বনের দৌলতে এখানকার প্রাকৃতিক ভারসাম্য আজও বজায় আছে। হরিণ তৃনভোজী প্রাণী, যে কারণে হরিণের অবস্থান যদি সুন্দরবনে বেশি হতো তবে গভীর বাস্তুতন্ত্রের উদ্ভিদ সম্পদের উপর আঘাত আসতো। কিন্তু বাঘ আছে বলে হরিণের ভারসাম্য ও রক্ষিত আছে। ফলত এই শৃঙ্খলা বোধ হয় পরিবেশের সামঞ্জস্য ও বজায় রাখে।

সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্র বা ডীপ ইকলজিকে কেন্দ্র করে প্রাণীজ সম্পদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হল বাঘ। সারা বিশ্বের কাছে বাংলার বাঘ Bengal tiger বা Panthara tirgris linn এবং বর্গ (order) Cornivora শ্রেণী ও স্তন্যপায়ী (mammalia) রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার নামে পরিচিত। ইউরোপীয়রা এর এরূপ নামকরন করেছেন।

সুন্দরবন বাসীর কাছে বাঘের বিভিন্ন নাম রয়েছে। গভীর অরণ্যে যে সব মউলে, বাউলে, কাঠুরে, জেলে প্রভৃতি মধু-মাছ-কাঠ সংগ্রহে যান তাদের কাছে বাঘের বিভিন্ন নাম, যেমন কাবলিওলা, বড়মিয়াঁ, মুশো, বন্ধু, মামাবাবু, ফকিরবুড়ো, বাবুমশাই, ডোরাকাটা, বড় হরিণ ইত্যাদি। অনস্বীকার্য, সমীহ জাগানো সৌন্দর্যের জীবন্ত এক প্রতীক হল বাঘ। তার সাহসিকতা ও সৌন্দর্য আজ কিংবদন্তি। দক্ষিণ রায় নামে দেবতার আসনে বাঘ সুন্দরবনবাসির নিকট পূজিত হন। দেহের আকৃতির দিক থেকেও তার বিশালতা রয়েছে। সুন্দরবনের বাঘ ৮ হাত পর্যন্ত দীর্ঘ এবং ৪ ফুট পর্যন্ত উচুঁ হয়। সুন্দরবনের একটি বাঘ দাঁড়ালে কাঁধ পর্যন্ত ৩৬ ইঞ্চি থেকে ৪০ ইঞ্চি পর্যন্ত উঁচু হয়। এর মাথার পরিধি ২৭ ইঞ্চি, ঘাড় ৩২ ইঞ্চি। একটি পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ বাঘ লম্বায় ১১ ফুটের কাছাকাছি, ওজন ৭ থেকে সাড়ে ৭ মন, এবং বাঘিনী ৯ ফুট থেকে সাড়ে ৯ ফুটের বেশি হয় না[১১]।

বাঘের আদি নিবাস সাইবেরিয়া। এখানে প্রচন্ড তুষারপাত হওয়ার কারনে আশ্রয়স্থল, পানীয় জল ও খাবার প্রভৃতিতে সঙ্কট তৈরি হয়। যে কারণে বাঘেরা প্রথমে আমুর হয়ে মাঞ্চুরিয়া প্রবেশ করে। সেখান থেকে একটা দল ইন্দোনেশিয়া, জাভা, বার্লি, বার্মা ও মালয়ের দিকে অগ্রসর হয়। অপর দলটি চাকমাহিলস অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশ করে ও ধীরে ধীরে সারা ভারতে তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করেতে সচেষ্ট হয়।

বর্তমানে ১৪০ টি পুরুষ বাঘ, ১১৮ টি বাঘিনী ও ৪৭ টি বাচ্চা বাঘ সুন্দরবনের অধিবাসী। ১৯৯৯ সালের বাঘসুমারী অনুযায়[১২]। বাঘের উপস্থিতি কিন্তু সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যকে বজায় রাখে। চোরাশিকার করতে শিকারি ভয় পায়। সুন্দরবনের সম্পদ রক্ষা পায়।

হরিণঃ সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের উপর এক উল্লেখযোগ্য প্রাণী বা প্রাণীসম্পদ হল হরিণ। সুন্দরবনে স্থলচর জন্তুর মধ্যে চিতল হরিণের ও সম্বর হরিণের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি প্রায় ৩০

হাজারেরও অধিক। সাধারণত সুন্দরবনের হরিণ যুতবদ্ধ এবং আরামপ্রিয় জীব। অরণ্যের মধ্যেকার ছায়াযুক্ত জায়গা এদের পছন্দের বিশ্রামস্থল। সুন্দরবনের পূর্ণবয়স্ক হরিণের দীর্ঘ লেজ সহ ১৩০ সেমি, উচ্চতা ১৫০ সেমি। গড় ওজন ৬০ কিলোগ্রাম। বাঁচে গড়ে ১৫ বছর। বাঘের শতকরা ২০ ভাগ খাদ্য সরবরাহ করে হরিণ[১৩]। আভিজাত্যের একটা জায়গা জুড়ে সুন্দরবনের হরিণ গভীর বাস্তুতন্ত্রে বিরাজ করে। হরিণের চামড়া ও সিংহের চামড়ার বাজার মূল্য যথেষ্ট। গাছের পাতা ও তৃণ প্রধান খাদ্য। কেওড়ার পাতা ও ফল এদের সুস্বাদু খাদ্য। সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসাবে হরিণ যেমন বন্যসম্পদ হিসাবে বাস্তুতন্ত্রের শৃঙ্খলাতে অবস্থান করে কাজ শেষ করে তাই নয়, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পূর্বাভাস দিতে সে সহযোগিতা করে। কোনও স্থানে ঝড়-জল-বন্য-ভুমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয় আরম্ভ হওয়ার আগে প্রাণীটির আচরণে অস্বাভাবিকত্ব দেখা যায়। ১৯৭৯ সালের একটি দিনে ঝিলা ব্লক অঞ্চলে কতকগুলি চিতল হরিণকে একটি উঁচু জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। তাদের কাছাকাছি মানুষের যাতায়াত সত্ত্বেও তারা পালিয়ে যায়নি। হরিণদের এহেন আচরন সুন্দরবন বিশেষজ্ঞদের কাছে অস্বাভাবিক মনে হয়েছে। বিকেল প্রায় ৩ টার সময় ওখানকার নদীতে জলোচ্ছ্বাস দেখা দেয়। হরিণগুলিকে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন ওই বিশেষজ্ঞ[১৪]।

বানরঃ স্তন্যপায়ী স্থলজন্তু হিসাবেই পরিচিত বানর। সুন্দরবনের বানর পর্ণভোজী। ধূসর বা বাদামী, হালকা লালচে মুখমন্ডল। একটা পূর্ণবয়স্ক বানরের শরীর ২ ফুট, লেজ ১ ফুটের বেশি প্রায়। এরা হরিণের স্বাভাবিক বন্ধু ও অভিভাবক। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী বাঁদর ছোট। হরিনণের পিঠে সওয়ার হয়ে ভ্রমণও করে বানর। নিরামিষাশী বাঁদর বা বানর দলবদ্ধ ভাবে থাকতে ভালোবাসে।

কুমিরঃ সুন্দরবনের গুরুত্বপূর্ণ বন্যপ্রাণী হিসাবে যার কথা বলা দরকার তা হল কুমির। প্রবাদে রয়েছে ডাঙায় বাঘ আর জলে কুমির। সুন্দরবনের কুমির পৃথিবী বিখ্যাত ও ভয়ংকর রকমের হিংস্র। সুন্দরবনের কুমির (এসটুয়াসাইন ক্রোকোডাইন) ২০-২৫-৩৫ ফুট পর্যন্ত দীর্ঘ হয়ে থাকে। পৃথিবীর বৃহত্তম কুমীরই সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের ভারিত্ব বজায় রাখে। উভয়চর এই প্রাণীটি দেখতে নিরীহ মনে হলেও ভয়ংকর ভাবে হিংস্র। কুমির শিকার ধরতে ভীষণ ভাবে পটু। কখনো ওরা পিছু হটতে জানে না। নদীর চিংড়ি ও কাঁকড়া সাধারনত কুমিরের প্রিয় খাদ্য বলে গণ্য হয়। বিশ্বের কাছে সুন্দরবনের এই কুমিরের চাহিদা খুব। এই সুন্দর সরীসৃপটাকে পৃথিবীর বুক থেকে হারিয়ে না ফেলতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বনদপ্তর দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার পাথর প্রতিমা থানার ভগবতপুরে কুমির প্রকল্প গড়ে তুলেছে। এই প্রকল্পের অবশ্য একটা গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য রয়েছে, তা হল বনাঞ্চলের বিভিন্ন স্থান থেকে কুমিরের ডিম সংগ্রহ করে এনে তার থেকে বাচ্চা তৈরি করা এবং সেখান থেকে বিদেশী মুদ্রা অর্জন করা। যেভাবে তামিলনাড়ুতে ক্রোকোডাইল ব্যাঙ্ক তৈরি হয়েছে বা ওড়িস্যায় তৈরি হয়েছে কুমির প্রকল্প ঠিক সেই ধারণায় পাথর প্রতিমা ব্লকের ভগবতপুরে সুন্দরবনের কুমির প্রকল্প তৈরি হয়েছে[১৫]। এর ফলে বন্যসম্পদ আর নষ্ট হয় না বরং বাড়ছে।

বন্যশুকরঃ জন্তু হিসাবে সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রে বন্যশুকর এক উল্লেখযোগ্য নাম। প্রায় তেরো হাজারের মতো বন্যশুকর বাস করে সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রে। ৪-৫ ফুট লম্বা হয় একটা পূর্ণবয়স্ক বন্যশুকর। তার লেজ প্রায় ১ ফুট এবং উচ্চতা ৩ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। এরা ছোট ছোট বাঘের শাবক ধরে খেয়ে ফেলে। তাছাড়া বাঘেরও শতকরা ৬০ শতাংশ খাদ্য জোগায় এই বন্যশুকর[১৬]।

কাঁকড়াঃ সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের পোকা হিসাবে চিহ্নিত এই প্রানীটি। প্রায় ৩০-৪০ রকমের কাঁকড়া দেখতে পাওয়া যায় এখানে। সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রকে ঘিরে যে সমস্ত রকমের কাঁকড়া পাওয়া যায় তাদের মধ্যে প্রধান- এক দাঁড়ওয়ালা লাল-হলুদ-নীলচে কাঁকড়া, গেছো কাঁকড়া, চিতি কাঁকড়া, পাতি কাঁকড়া, কালো কাঁকড়া, নোনা কাঁকড়া, গোল কাঁকড়া, লজ্জাবতী কাঁকড়া, সন্ন্যাসী বা সাগর কাঁকড়া ইত্যাদি। পরিবেশের ঝাড়ুদার পাখি হিসাবে কাক যেমন সর্বাধিক পরিচিত একটি প্রাণী, তেমনিভাবে সুন্দরবনের ঝাড়ুদার প্রাণী হিসাবে পরিচিত কাঁকড়া পচনশীল বস্তু সামগ্রী খেয়ে সুন্দরবনের জলের দূষণ নিয়ন্ত্রন করে। ভারতীয় সুন্দরবনের এই কাঁকড়ার আন্তর্জাতিক মূল্য অনেক। প্রচুর বিদেশি মুদ্রা অর্জন করা হয় এই কাঁকড়া রপ্তানি করে। খাদ্যোপযোগী নোনা বা সমুদ্র কাঁকড়ার বিজ্ঞানসম্মত নাম স্কাইলো সেরেটা। আকারে বড়, দৈর্ঘ্যে ১৮০ মিমি, ওজন কম বেশি ২০০ গ্রাম থেকে ২ কিলোগ্রাম পর্যন্ত হয়ে থাকে[১৭]। কাঁকড়া পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ তো বটেই এছাড়া কাঁকড়া থেকে মূল্যবান ঔষধ ও প্রস্তুত হয়ে থাকে।

মাছঃ বিশালাকার জলাভূমিতে সমৃদ্ধ সুন্দরবন। এর মধ্যে প্রাকৃতিক জলাশয় ১৯২০ বর্গ কিমি, ৪৫১৪.২৬ বর্গ কিমি জলসংলগ্ন নিচু জমি বা জলকর ইত্যাদি এবং কয়েকশ বর্গ কিমি স্বাদুজলের পুকুর-বিল-ঝিল। এখানে মাছের মূল উৎস প্রাকৃতিক জলাশয়, যা প্রতিদিন ২ বার জোয়ার-ভাঁটা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। স্বাদুজলের অসংখ্য প্রজাতির মাছ যেমন রয়েছে তেমনিই লবনাক্ত জলের মাছ ও রয়েছে প্রায় ১৩০ প্রজাতির। লবনাক্ত জলের যে সমস্ত মাছ গুলি আমাদের তথা মানব সমাজের প্রাত্যহিক খাদ্যতালিকাভুক্ত ও অর্থনৈতিক কারণে বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ সে গুলি হল- পারশে, রামপারশে, ভাঙ্গন, ভেটকি, খেড়ে ভেটকি, কৈভোলা, ভোলাপমফ্রেট, সাদা পমফ্রেট, কালো পমফ্রেট, ইলিশ, খোকা ইলিশ, পাঙ্গাশ, তোপসে, খয়রা, নিহেড়ে বা লুইট্যা, ফ্যাসা, গুরজাউলি, পাত্তা বা

কুকুরজীব, আমুদি, রুলি, চাঁদা, পায়রা চাঁদা, সামুদ্রিক ট্যাংরা, শংকরমাছ, পায়রাতলি, বোয়াল, বক মাছ, তেলাপিয়া, গাংরুই, বাগদা, চিংড়ি, চেড়ে বাগদা, চাপড়া চিংড়ি, গলদা, কড়া চিংড়ি, লাউঘটি চিংড়ি প্রভৃতি। যদিও কাঁকড়ার মতো চিংড়ি ও জলের পোকা, তবুও এরা খাদ্যগুণে ভরপুর।

মিষ্টি জলেও যে সব মাছ পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে উল্লেখজোগ্য-রুই, কাতলা, মৃগেল, বাতা, সিল্ভার কার্প, গ্রাসকার্প, তেলাপিয়া, জিওল প্রজাতির কই, মাগুর, শিঙ্গি, শোলমাছ, ল্যাটামাছ, বোয়াল, ভেটকি, পুঁটি তাছাড়া মৌরলা, চাঁদা, খলসে, ট্যাংরা, শোলট্যাংরা, প্রভৃতি। সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের এই সম্পদ অর্থাৎ সুন্দরবনের মাছের বার্ষিক উৎপাদন গড় ৩০ হাজার মেট্রিকটন, যা স্থানীয় প্রয়োজন মিটিয়ে ব্যাবসায়িক ভিত্তিতে পার্শ্ববর্তী জেলা ও রাজ্য সহ বিদেশেও পৌছে যাচ্ছে।

মৌমাছিঃ সুন্দরবনের অরণ্য প্রকৃতির এক অমূল্য উপাদান হল মধু। মধু পান অমৃত পানের সমান। সুন্দরবনবাসীদের এই প্রবাদ এখন লোকপ্রবাদে পরিনত হয়েছে। যাইহোক গভীর বাস্তুতন্ত্রের এই সুমিষ্ট অমৃত মধু যে উৎপন্ন করে তা হল মৌমাছি।

পবিত্র কোরানেও মৌমাছি সম্পর্কে একটি অধ্যায় লিপিবদ্ধ আছে[১৮]। সুন্দরবনের এই মৌমাছির এক আশ্চর্য দান বলা হয় মধু। সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের মৌমাছি যাযাবর শ্রেণীর। সাইবেরিয়া থেকে হিমালয় এবং সেখান থেকে নববসন্তে এরা সুন্দরবনে উড়ে আসে। কালচে লাল রঙের, পূর্ণ বয়স্ক মৌমাছি ২ সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। সুন্দরবনের ঘন জঙ্গলে মৌমাছির চাক বাঁধার অনুকূল এক পরিস্থিতি থাকায় এখানে প্রচুর মধু ও মোম উৎপন্ন হয়। ১ ঘনফুট মৌচাক থেকে পাওয়া যায় প্রায় ৩ কিলোগ্রাম মধু। মৌমাছিরা সাধারণত ২৫ মিটার দুরত্বে মৌচাক গঠন করে। সাধারণত গেঁওয়া, বাইন, গরান, গর্জন, সুন্দরী, কেওড়া, পশুর কাঁকড়া, ধুঁদুল প্রভৃতি গাছে মৌমাছি চাক বাঁধতে পছন্দ করে। সুন্দরবনের মধু জগৎ সংসারের কাছে এক উপাদেয় খাদ্য। সাধারণত যে সমস্ত

বৃক্ষরাজি মৌচাক গঠনে সাহায্য করে তাদের পারস্পারিক শতকরা আনুপাতিক হার[১৯] নিচে একটি সারণিতে দেখানো হল-

বৃক্ষ	শতকরা হার
বাইন	১৬%
সুন্দরী	৯%
পশুর	২.৮%
গর্জন	১০%
গেঁওয়া	৩৯%
কাঁকড়া	৩.৫%
ধোন্দল	১.৯%
গরান	১১%
কেওড়া	৫.৩%
অন্যান্য	১.৫%

সুত্রঃ- জল, জঙ্গল ও জনজিবনে সুন্দরবন, শচীন দাশ, পৃষ্ঠা- ৫৫

মধুর অর্থকরী গুণ অসীম। তাছাড়া মধুর সাহায্যে ঔষধ বা ঔষধের অনুপাত প্রস্তুত হয়ে থাকে। সমস্ত ফুলের মধ্যে মধু অবস্থান করে। তবে সুন্দরবনের গরান মধু সর্বশ্রেষ্ঠ বলে প্রতিপন্ন হয়।

পাখিঃ সুন্দরবনের এই গভীর অরণ্যে জল-জঙ্গলে ঘেরা পরিবেশে পাখির সঙ্গে সম্পর্ক সুনিবিড়। সুন্দরবনের এই জঙ্গলে ১৮৬ প্রজাতির পাখি ও অতিরিক্ত প্রায় ৫০ প্রজাতির পরিযায়ী পাখি লক্ষ্য করা যায়। সুন্দরবনের সজনেখালি এমন একটি জায়গা যেখানের পাখির সংখ্যাধিক্য অবস্থানের জন্য নাম হয়েছে পাখিরালয়। সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রে পাখির আগমন ঘটে সাধারনত জুন থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যে। দেশ-দেশান্তর থেকে এমনকি হিমালয় থেকেও পাখিদের দল এসে ভিড় করে এই অরণ্যে। সুন্দরবনে যাযাবর পাখিদের মধ্যে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পাখি হল ছোট ও বড় পুলিন্দা, আরাবিল, ও কমনস্যান্ডপাইপার, জিরালি, গগনবেড়, গোত্রা, মিটুয়া ইত্যাদি। স্থায়ীভাবে বেশ কিছু পাখি সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রকে এক অনুপম সৌন্দর্যে আচ্ছাদিত করেছে। তাদের মধ্যে জনপ্রিয় কণ্ঠিঘুঘু, গয়ারঘুঘু, টিয়া, শ্যামসুন্দর, কাবাসী, পানকৌড়ি, গ্যাংশালিক, বড়কাবাসী, বাহারী ডানাওয়ালা কাটঠোকরা, ফিঙ্গে, শালিক, চন্দনা, চড়াই, দোয়েল, চাতক, চিল, শকুন, দাতরা, টুনটুনি, দাঁড়কাক, পাতিকাক, পায়রা, মানিকজোর, বনমোরগ, বউ কথা কও এছাড়া আরো নানান প্রজাতির রং-বেরঙের পাখির সন্ধান পাওয়া যায়, যা সুন্দর বনের গভীর বাস্তুতন্ত্রে বিরাজ করে।

উদ্ভিদ ও প্রাণী বৈচিত্র্যের নিরিখে সুন্দরবনের খ্যাতি বিশ্বজোড়া, সুন্দরবনে সে কারণে স্থাপিত হয়েছে ব্যাঘ্র প্রকল্প (১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দ), কুমির প্রকল্প (১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে) এবং সুন্দরবন ঘোষিত হয়েছে জাতীয় উদ্যান (১৯৮৪) হিসাবে। তাছাড়া ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে সুন্দরবনে তৈরি হয়েছে তিনটি অভয়ারন্য যথা- ১। লোথিয়ান আইল্যান্ডঃ সুন্দরবনের দক্ষিন প্রান্তে প্রায় ৩৮ কিলোমিটার স্থান জুড়ে এই অভয়ারণ্য বিস্তৃতি। বাঘ, চিতল হরিণ, বুনোশুয়োর, কুমির, জলজ প্রাণী এখানে দেখা যায়। ২।

হ্যালিডে অভয়ারণ্যঃ এর বিস্তৃতি প্রায় ৬ বর্গ কিলোমিটার। এখানকার উল্লেখযোগ্য প্রানীদের মধ্যে বাঘ, চিতল হরিণ ও জলজ পাখি অন্যতম। ৩। সজনেখালি অভয়ারন্যঃ প্রায় ৩৬২ বর্গ কিলোমিটার জায়গা জুড়ে এই অভয়ারণ্যে পাখির সমাবেশ বেশি। তাছাড়া বাঘ ও চিতল হরিণ দেখা যায়। পাখিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- পানকৌড়ি, পেলিক্যান, মহাকার্বা, কাচিয়াতোরা, অন্যতম।

মানবসম্পদঃ "কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে, সমুদ্রে হল হারা।
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন-
শক-হুন-দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।"

হাজার হাজার মানুষের রক্ত ধারার সংমিশ্রণে জনপদ গড়ে উঠেছে নয়নাভিরাম সৌন্দর্যমণ্ডিত ম্যানগ্রোভ বাদাবন সুন্দরবনে। শত শত মানব জীবন-জীবিকার আন্দোলনে জাত-পাত ও ধর্মের ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে এক অখণ্ড জনগোষ্ঠী, গভীর প্রাণময় অথচ ভয়ংকর ভয়সঙ্কুল গভীর অরণ্যে নিজেদের অস্তিত্ব অক্ষুন্ন রেখেছে। জীবনধারাকে চলমান রেখেছে।

মূলত সুন্দরবন অঞ্চলে বিভিন্ন এলাকার মানুষ এসে এখানে ভীড় জমিয়েছে। যদিও সুন্দরবনের লোকসংখ্যার ধারাবাহিক হিসাব ঠিকমতো পাওয়া যায় না। জঙ্গল হাসিলকে কেন্দ্র করেই মূলত জনসংখ্যার চাপ বেড়েছে সুন্দরবনে। তবে ঠিক কবে সুন্দরবনে মানুষের আবির্ভাব বা পদার্পণ তার সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া বাস্তবিকই কঠিন। কেননা বিশেষজ্ঞরা অনুমান করেন যে খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দে

এই অঞ্চলে মানুষের অস্তিত্ব ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব প্রায় তিন-চারশো বছর আগে দক্ষিণবঙ্গে গঙ্গারিডি নামক এক বীর জাতীর রাজত্বের পরিচয় আমরা পাই। ৩২৭ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ মেসিডনের অধিশ্বর দিগ্বিজয়ী সেকেন্দর যখন পঞ্চনদ অধিকার করে বিপাশার তীরে উপনীত হয়েছিলেন, তখন তাঁর শিবিরে গঙ্গারিডি নামক রাজ্যের সংবাদ পৌঁছেছিল। এর কিছুকাল পরে গ্রিকদূত মেগাস্থিনিস পাটলীপুত্র নগরের পূর্ব দিকে অবস্থিত গঙ্গারিডি নামক স্বাতন্ত্র্য রাজ্যের উল্লেখ করে গেছেন।

এ অর্থ এই নয় যে সেই রাজত্বকাল থেকেই সুন্দরবনে মানব সভ্যতা বা মানব সাম্রাজ্যের শুরু। তবে কালের নিয়মে মানুষের ভীড় জমেছে সুন্দরবনের গভীর অরণ্যে। খ্রিষ্টীয় প্রথম শতকে উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে এ অঞ্চলে ঘোড়া ও অন্যান্য ব্যবসার জন্য যারা এসেছিল তারা শক ও য়ত্র-চি জাতির মানুষ ছিলেন। বিভিন্ন ঐতিহাসিক একথা মনে করেন যে খ্রিষ্টীয় ৩৭৬ সালে সুন্দরবন গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধিনস্ত হয়[২০]। এভাবে নানান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে কালের স্রোতে বহু মানুষের স্রোত এখানে বইতে থাকে। আবার মধ্য যুগেও এখানে এসে উপস্থিত হয় পর্তুগীজ ও ফারসি ভাষাভাষীর মানুষ। ভারতের ইতিহাস পড়লে জানা যায় যে বর্গি আক্রমন এতটাই প্রবল আকার ধারন করেছিল যে, সেই বর্গি আক্রমনে অস্থির হয়ে দলে দলে মানুষ এসে ভীড় জমিয়েছিল সুন্দরবনের গভীর অরণ্যে।

এদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিল ব্রাহ্মন ও কায়স্থ সম্প্রদায়ের মানুষ। ১৮৮১ সালে জনগননা অনুসারে সুন্দরবন সহ ২৪ পরগনায় ২৬৬ প্রকার জাতির মানুষ বাস করতো[২১]।

সুন্দরবনের জঙ্গল হাসিলকে কেন্দ্র করেই আবাদ তৈরির প্রথম পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন ২৪ পরগণা জেলার কালেক্টর জেনারেল মিঃ ক্লড রাসেল[২২]। উদ্দেশ্য অবশ্য খাজনা পাওয়ার বাসনা। এই উদ্দেশ্যকে সহায়তা দানে এগিয়ে আসেন টিলম্যান হেংকেল সাহেব। জিনি ছিলেন অধুনা বাংলাদেশের

যশোহরের প্রথম ম্যাজিস্ট্রেড। ১৭৮৪ সালে হেংকেল সাহেব সুন্দরবনকে কৃষিযোগ্য করার জন্য সুপারিনটেনডেন্ট হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভের পর যখন ১৭৯৩ তে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হল তখনও পর্যন্ত সুন্দরবন কিন্তু এই ভূমি ব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কিন্তু ক্লড রাসেল ও হেঙ্কেল সাহেবের হাত ধরেই জঙ্গল হাসিল শুরু হতেই জনতার স্রোত জমতে শুরু করে সুন্দরবনের জঙ্গলে। আঘাত পড়ে গভীর বাস্তুতন্ত্রের উপর। যাইহোক অষ্টাদশ শতকের শেষে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে সুন্দরবনের জঙ্গল কেটে চাষ আবাদ আরম্ভ করা হয়। ভিন জায়গার বিভিন্ন আরণ্যক সম্প্রদায় এবং শ্রমজীবি মানুষের প্রবাহ সুন্দরবনে আছড়ে পড়ে। মেদিনীপুরের ভুমিজ, ছোটনাগপুর এলাকার ও রাঁচি অঞ্চলের সাঁওতাল সম্প্রদায়েরা, তাছাড়া ওঁরাও, গন্ধভুমিজ প্রভৃতি আদিবাসী। উড়িষ্যার দরিদ্র মানুষের সম্মিলিত প্রবাহ, যাদের জীবিকা ছিল সমুদ্রের জল থেকে নুন তৈরি কৌশল, ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তাদের রাজস্ব বাড়ানোর লক্ষ্যে সত্য-মিথ্যা প্রভৃতি প্রতিশ্রুতি, ও নানান কৌশল অবলম্বন করে মানুষদের প্ররোচিত করে নিয়ে আসে সুন্দরবনে। গভীর বাস্তুতন্ত্রে জায়গা করে নেয় প্রাণী ও উদ্ভিদ সম্পদের মতো মনুষ্য সম্পদ। মানুষের স্রোতে সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রসহ ২৪ পরগণা প্লাবিত হয়ে যায়।

১৮৮১ সালের জনগণনায় জানা যায় যে সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রকে ঘিরে লোকসংখ্যা ছিল ১০,০৩,১১ জন। বর্তমানে সুন্দরবনে প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষ বসবাস করে।

বিগত প্রায় দুইশত বৎসর কাল যাবৎ সুন্দরবনের গভীর ঘন জঙ্গল সংস্কার শুরু হয়। শুরু হয় ম্যানগ্রোভ অরণ্য ধ্বংসের কাজ। বিস্তার ঘটে আবাদভূমির। কৃষি ভূমির বিস্তার, আর মাছ চাষের ভেড়ি তৈরির জন্য চলতে থাকে অরণ্য পরিষ্কার, এর ফলেই দ্রুততার সাথেই জনবসতির বিস্তার ঘটে। ‘জনসংখ্যা বাড়তে বাড়তে পশ্চিমবাংলার অন্তর্গত সুন্দরবনের বন হাসিল করা ৫৩৬৪ বর্গ

কিমি অঞ্চলে ২০১১-র জনগণনা অনুযায়ী সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৪,২৬,২৫৪। সুন্দরবনাঞ্চলে গত ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দেখানো হল-

অবিভক্ত সুন্দরবনের জনসংখ্যা	১৭৭২ খ্রিঃ	২,৯৬,০৮৫ জন
অবিভক্ত সুন্দরবনের জনসংখ্যা	১৯০১ খ্রিঃ	৪,৮৭,৩৭৭ জন
অবিভক্ত সুন্দরবনের জনসংখ্যা	১৯৩১ খ্রিঃ	৭,৫৪,৪২১ জন
ভারতীয় সুন্দরবনের জনসংখ্যা	১৯৫১ খ্রিঃ	১১,৫৯,৫৫৯ জন
ভারতীয় সুন্দরবনের জনসংখ্যা	১৯৬১ খ্রিঃ	১৪,৪৬,২৮২ জন
ভারতীয় সুন্দরবনের জনসংখ্যা	১৯৭১ খ্রিঃ	১৮,০০,০০০ জন
ভারতীয় সুন্দরবনের জনসংখ্যা	১৯৮১ খ্রিঃ	২৭,০০,০০০ জন
ভারতীয় সুন্দরবনের জনসংখ্যা	১৯৯১ খ্রিঃ	৩১,৫৪,৮৯০ জন
ভারতীয় সুন্দরবনের জনসংখ্যা	২০০১ খ্রিঃ	৩৭,৫৫,৯২৬ জন

সুত্রঃ- শ্রীখণ্ড সুন্দরবন, দেবপ্রসাদ জানা, পৃষ্ঠা- ১৫৯

এই পরিসংখ্যানে যে তথ্য জানা যায় তাতে দেখা যায় সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রকে ঘিরে আজ পরিপূর্ণ মনুষ্য সম্পদ। এখন সুন্দরবনকে ঘিরে ৭৮ হাজার আ দিবাসী বসবাস করে। তাছাড়া ভাগ্য পরীক্ষার তাগিদে দলে দলে মানুষ ভীড় জমিয়েছে এই অরণ্যময় গভীর বাস্তুতন্ত্রে। সবমিলিয়ে ম্যানগ্রোভ সম্পদ তথা উদ্ভিদ সম্পদ, প্রানীজ সম্পদ ও মনুষ্য সম্পদের আবহে সুন্দরবনের গভীর

বাস্তুতন্ত্র একটা ভারসাম্যহীন অবস্থানে রয়েছে বলে মনে হয়। নিম্নে দেখানো হল পশ্চিমবঙ্গ সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ ও অনুষঙ্গী অ-ম্যানগ্রোভ লতাগুল্মের উদ্ভিদ তালিকা-

বাংলা নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
গর্জন, তোরা	Rhizophora apiculata
গর্জন, খামু	Rhizophora mucronata
কাকড়া	Bruguiera Gymnorrhiza
কাকড়া	Bruguiera suxangulata
বকুল কাকড়া	Bruguiera cylindrical
বকুল কাকড়া	Bruguiera paruiflora
জামটি গরান	Ceriops decandra
মট গরান	Ceriops tagal
গোরিয়া	Kandelia candel
কালো বানী/বাইন	Avicennia alba
জাত বানী/বাইন	Avicennie officinalis

পেয়ারা বানী/বাইন	Avicennie marina
সাদাচক কেওরা	Sonneratia alba
চক কেওরা	Sonneratia casealaris
ওরা	Sonneratia griffithii
কেওরা	Sonneratia apetala
কৃপা/কৃপাল	Lumnitzera racemosa
গোলপাতা	Nypa fruticans
ধুন্দুল	Xylocarpus granatum
পাসুর	Xylocarpus mekongensis
আমুর	Xylocarpus cucullata
গেঁও/গেঁওয়া	Excoecaria agallocha
তোরা	Aegialitis rotandifolia
সুন্দরী	Heritiera fomes
তাগরী বানী	Scyphiphora hydrophyllaca

হুডো ফার্ন	Acrostichum aureum
হরকোচ	Acnthus ilicifolias
লতা-হরগোজ	Acanthus volubills
লতা সুন্দরী	Brownlowia tersa
বনকাপাস	Hibiscus tiliaceus
বনকাপাস	Hibiscus tortusus
পরস	Thespesia populneoides
গিলা	Cynometra ramiflora
নাটা করঞ্জা	Ceasalpinia bonduc
শিউরি লতা	Ceasalpinia crista
চুলিয়া কাঁটা	Dalbergia spinosa
নোয়া লতা	Derris scandens
পান লতা	Derris trifoliate
করঞ্জা	Derris indica

হেঁতাল	Phoenix peludosa
হিজল	Barringtonia asiatica
সুমুদ্র	Barringtonia recemose
গরশিঙ্গিয়া	Dolichandrone spathacean
কাঠ বাদাম	Terminalia catappa
বন গাব	Diospyros ferrea
ধানি ঘাস	Porterasia Coarctata
নালাই ঘাস	Myriostachya wighliana
নোনা দূর্বা	Aeluropus lagopoides
নাগ ফনা/ফনি মনসা	Opuntia dillenii
নোনা বেগুন	Solanum trilobatum
খলসি	Aegiceras corriculatum
ছোট মান্দা	Macrosolen cochirchinensis
মান্দা	Viscum monoicum

ছাগল কুড়ি	Ipomoea pes-caprae
মান্দা	Viscum orientale

সুত্রঃ- শ্রীখণ্ড সুন্দরবন, সম্পাদনা-দেবপ্রসাদ জানা, পৃষ্ঠা ২৮০,২৮১

সুন্দরবনের প্রধান প্রধান প্রানীসম্পদ প্রায় ৪০ রকমের বেশি স্তন্যপায়ী প্রাণী সুন্দরবনে আছে।

প্রধান কয়েকটি স্তন্যপায়ী প্রাণী	বৈজ্ঞানিক নাম
বাংলার বাঘ	Panthera tigris tigris
চিতল হরিণ	Axis axis
বুনোশুয়োর	Sus scrofa
রেসাস বানর	Macaca mullata
সেনালি শেয়াল	Canis aureus
ধারী ব্যান্ডিকূট ইঁদুর	Bandicuta indica
বন বিড়াল	Felis bengalensis
ভোঁদড়	Lutra lutra
গাঙ্গেয় শুশুক	Platanista gangetica

ইরাবদ্দি শুশুক	Orcella sp.

সুত্রঃ- শ্রীখণ্ড সুন্দরবন, সম্পাদনা- দেবপ্রসাদ জানা, পৃস্থা -২৮২

প্রধান প্রধান সরীসৃপ পাওয়া যায় ৪০ এর বেশি-

পোরোসাস কুমির	Crocodilus porosus
অলিভ-বিডলে কচ্ছপ	Lepidochelys olivacea
গাঙ্গেয় কচ্ছপ	Trionyx gangeticus
তারকেল বা বড়ো গোসাপ	Varanus salvator
কেউটে	Naja naja
ময়াল সাপ	Python morulus

সুন্দরবনে উভচর প্রাণী পাওয়া যায় ১১ টিরও বেশি-

কুনো ব্যাঙ	Bufo melanostictus
কোলা ব্যাঙ	Rana trigrina
ছ-আঙুলে সবুজ ব্যাঙ	Rana hexasactyla

গেছো ব্যাঙ	Rana cyanophlictis
জলের সাইনো ফ্লিকটিস ব্যাঙ	Rhacophorus maculata

২০০ এর বেশি মাছের প্রজাতি পাওয়া যায় -

ইলিশ	Hilsa(Tenualosa) ilisha
ভেটকি	Lates calcarifer
ভাঙড়, পার্শে	Liza parsica and liza tade
গুরজাউলি	Eleutheronema tetradactylum
ভারতীয় সার্ডিন	Sardinella fimbriata
আর জাতীয় মাছ	Pangasius pangasius
পরিযায়ী বানমাছ	Anguilla bengalensis
ডাকুর মাছ	Boleophthalmus boddertii
নেহারি মাছ	Harpodon neharius
ভোলা মাছ	Daysciana albida

সুত্রঃ- শ্রীখণ্ড সুন্দরবন, দেবপ্রসাদ জানা, পৃ- ২৮২

তরুনাস্থি মাছ- Cartilagenous fish

1. ৯ টি হাঙরের প্রজাতি তার মধ্যে হাতুরি মাথা হাঙরও আছে।
2. ৬ টি শঙ্কর মাছের প্রজাতি।
3. ৪ টি স্কেট ও করাত জাতীয় হাঙর মাছ।

সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের ক্রমবিবর্তনের ধারা

একটা কথা যা লোকপ্রবাদে পরিনত হয়েছে যে, যে দিন থেকে আদিম মানুষ আগুন জ্বালাতে বা তার ব্যবহার শিখলো আর সেদিন থেকেই শুরু হল প্রকৃতির ওপর ধ্বংসের লীলা। লোকপ্রবাদটি আজ যেমন বিশ্ববাসীর জন্য প্রযোজ্য তেমনিভাবে সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। আজ আমরা স্বীকার করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যে সুন্দরবনে যেদিন মানুষ প্রবেশ করলো ঠিক সেইদিন থেকেই সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের ধারাটাও পাল্টাতে শুরু করলো।

উপরিলিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বা বেশ কয়েকটি সারণিতে যে উদ্ভিদ সম্পদ, প্রাণী সম্পদ ও মনুষ্য সম্পদের তালিকা তৈরি করা গেছে তাতে করে নিশ্চিত যে সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রকে ঘিরে, গভীর অরণ্যকে ঘিরে একটা গভীর শৃঙ্খলিত পরিবেশ রচিত হয়েছে। কিন্তু এই শৃঙ্খলা সময়ের হাত ধরে দ্রুততার সাথে পরিবর্তিত হচ্ছে-হয়েছে-হবে। যদি আমরা সচেতন না হই এই ধারা আরও দ্রুত নিঃশেষের পথে নিয়ে যাবে আমাদেরকে। প্রকৃতির খামখেয়ালিপনা ও মনুষ্য

সম্প্রদায়ের লালসার বলি হচ্ছে সুন্দরবনের অরণ্য সম্পদ। ফলে বাস্তুতন্ত্রের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। সময়ের হাতে পড়ে বা সময়ের হাত ধরে সুন্দরবনকে গ্রাস করছে জনসম্পদ। সারা পৃথিবিতে প্রায় ৭০০ কোটি মানুষের বাস বর্তমান সময়কালে। ভারতবর্ষে বাস করে প্রায় ১২০ কোটি মানুষ। আর পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনে বাস করে প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষ।

জঙ্গল হাসিলের হাত ধরে আবাদ ভূমির সম্প্রসারণ বেড়েছে। ফলে সুন্দরবনের ১০২ টি অরণ্যময় দ্বীপের মাত্র ৫৪ টিতে ভূমি দখল করে মানুষের বসতি নির্মাণ হয়েছে।

সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের সম্পদ প্রতিনিয়ত ব্যবহার করে ৫০ লক্ষ মানুষের জীবন-জীবিকা নির্ধারিত হচ্ছে। এই জনবিস্ফোরন ক্রমাগত ধ্বংস করে চলেছে প্রকৃতির সঞ্চিত সম্পদের ভান্ডারকে। আপেক্ষিক দৃষ্টিতে যদি বিচার করি তবে একটা পরিসংখ্যান মুখে-মুখেই বর্ণিত হয় তা হল এই যে সুন্দরবনের ৫০ লক্ষ মানুষ, যদি প্রত্যেকেই সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের অংশ তথা মৎস্য সম্পদের ভক্ষক হয়ে থাকে, তবে প্রতিদিন প্রায় ৫০ লক্ষ মাছ পৃথিবী তথা সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্র থেকে হারাচ্ছে। যেটা আমরা গুরুত্ব দিয়েও বিচার করি না। বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যটা কি কাজ করছে এখানে, যদিও বা কাজ করে তবে তা কি করে? এর বিশ্লেষণ হয়তো আজ হবে না অদূর ভবিষ্যতে হয়তো বা হবে। যদি সুন্দরবন থাকে?

ভারতবর্ষের সুবিখ্যাত ও সর্ববৃহত্তম লবনাম্ব তথা ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের বনভূমি হল পশ্চিমবাংলার এই সুন্দরবন। পরিসংখ্যানে দেখা যায় ভারতবর্ষের মোট বনভূমির পরিমান ২৩ শতাংশ। এর মধ্যে আবার পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে ১৩ শতাংশ। যার অধিকাংশ জায়গা সুন্দরবন দখল করে আছে। সুন্দরবনের এই গভীর বাস্তুতন্ত্রকে ঘিরে পৃথিবী বিখ্যাত ৬৪ প্রজাতির ম্যানগ্রোভ বৃক্ষ, ১৩০ প্রজাতির মাছ ছাড়াও বিভিন্ন প্রজাতির ৪০ রকমের কাঁকড়া, হাঙর, কুমির, ঝিনুক, শামুক, ১৮৬ প্রকার পাখি

এবং অতিরিক্ত ৫০ প্রজাতির পরিযায়ী পাখি বর্ষা থেকে শীত পর্যন্ত সময়ে বসবাস করে, এবং স্থানীয়ভাবে বসবাস করে ২৫০ প্রজাতির পক্ষিকূল। সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রকে ঘিরে আছে বাঘ, সাপ শূকর সহ অন্যান্য ৩৫ প্রজাতির সরীসৃপ ও জল-স্থল-উভচর প্রাণী ও মোম মধু সহ নানান বনজ সম্পদ এবং অপর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ। উপরিলিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলতে সন্দেহ নেই বা অস্বীকার করার কোন জায়গা নেই যে এক বৃহৎ সম্পদশালী অরণ্যসমৃদ্ধ অঞ্চল এই সুন্দরনের গভীর বাস্তুতন্ত্র।

প্রাচীনকাল থেকেই এই সম্পদশালী বনরাজ্যে বা বলা যায় সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রে মানবসভ্যতার পদার্পণ ঘটেছে। সুন্দরবনে গভীর এই বাস্তুতন্ত্রে অবস্থানকারী মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যেকার কঠিনতম তথা অসম লড়াইটা চিরকালের, তথাপি এই গভীর বাস্তুতন্ত্রের অংশীভূত সমস্ত কিছুর মধ্যে একটা আন্তঃসম্পর্ক বর্তমান। লড়াই চিরকালীন হলেও নদী-জঙ্গল, কৃসিব্যবস্থা, জীবনচর্যা এখানকার গঠনশীল অর্থনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত।

সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্র কেন্দ্রিক ম্যানগ্রোভ অঞ্চলের বাস্তুরীতি, জল-স্থলের প্রাণীপুঞ্জের খাদ্য শৃঙ্খল ও উপযুক্ত পরিবেশ পরিস্থিতি বাস্তুতন্ত্রকে একটা নিশ্চিত স্থিতি দিয়েছিল একটা সময়ে। কিন্তু কালের অগ্রগতির হাত ধরে সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে অবস্থানকারী উদ্ভিদ ও প্রাণীসম্পদের আজ ধ্বংসের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সুন্দরবনের বনরাজ্য থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে বহু উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্পদ। বিপন্নবোধ করছে বহু বৃক্ষ ও প্রাণীজগৎ।

বলা হয়ে থাকে যে যার নামানুসারে গভীর বাস্তুতন্ত্রকেন্দ্রিক গাঙ্গেয় বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্যের অংশীদারি এই সুন্দরবন, সেই স্টারকুলিয়েসি গোত্রের উদ্ভিদ প্রজাতি সুন্দরী যার বিজ্ঞানসম্মত নাম হেরিটিয়েরা এইটন আজ বিলুপ্তির পথে। মানুষের লোভ ও

লালসার শিকারে পরিনত হয়ে নিজেকে আর সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের এক অমূল্য সম্পদ বলে প্রমাণ করতে সে ব্যর্থ। জঙ্গল হাসিলের হাত ধরে যতদিন সুন্দরবন সম্প্রসারিত হয়েছে সুন্দরী বৃক্ষের বিলুপ্তি ও সঙ্গে সঙ্গে এসেছে।

সুন্দরী বৃক্ষের পাশাপাশি সুন্দরবন থেকে যে সমস্ত ম্যানগ্রোভ শ্রেণীর বৃক্ষ বা উদ্ভিদ আজ বিলুপ্তির পথে তাদের মধ্যে অগ্রগন্য হল গোলপাতা (Nypa Fruticaus), গড়িয়া (Kandelia candal), টগরীবানী (Scyphiphora hydrophyllecea), বনলেবু (Alalantia correa), লতাহরগোজা (Acauthus volubilis), লতাসুন্দরী (Brownlowia lanceolata), কৃপা (Leemnitzxera racemosa), পশুর (Xylocurpus mekongensis), কাউফুল (Tylophora teneeis), ওড়া (Sonneratia griffit hit and alba), গর্জন (Rhizophora apiculata and mucronata), কাঁকড়া (Bruguiera sexngula and gymnorrhiya), আমুর (Aglaia cucullata), নোনা দূর্বা (Aeluropus lagopoides), হিজল (Barringtonia acutangula), বড়সীম বা বনসীম (Canavalia cathartica and lineate), অমললতা (Cissus triplia), করঞ্জ (Derris indica), বুনোগাব (Diospyros ferrea), গেঁওয়া (Excoecaria bicolas), বেঁচি (Flacourtia indica), লতা বেগুন (Sola num trilobatum), কলকে ফুল (Thenetia perevviana) প্রভৃতি[২৩]।

সূর্যের পশ্চিম দিগন্তে ঢলে পড়ার সাথে-সাথেই সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রে সন্ধ্যে নামে, আর এতেই ল্যাদাপোকা কিংবা শুয়োপোকার মত দেখতে অথবা কিছুটা সোনালি রং-এর বা লাল রং-এর গুবরে পোকার মতো অজানা এক বিচিত্র প্রজাতির পোকা সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভের পাতা খেতে শুরু করে ক্রমশ বৃক্ষের দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। ফলে এক সপ্তাহের মধ্যেকার সময়ের ব্যবধানে

রক্তিম আকার লাভ করে গভীর বাস্তুতন্ত্রকে ছেড়ে হারিয়ে যাচ্ছে বেশ কিছু লবনাম্বু বৃক্ষ। যেমন বাইন, গেঁউয়া, কেওড়া, জাত বাইন, জাত কেওড়াদি প্রভৃতি। সম্প্রতি, দ্য গ্রিন-এর জৈব খামার প্রকল্পের প্রভাবে বা প্রাকৃতিক আবহাওয়ার অবনমনে ম্যানগ্রোভ বৃক্ষ পোকার আক্রমনে বিপন্ন[২৪]। সন্ধ্যা নামলে তাদের আগমন বেশি ঘটে সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রে। তাই পাচার চক্রের হাত ধরে যেমন সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্র থেকে প্রাণী সম্পদ হারিয়ে যাচ্ছে ঠিক একই ভাবে অজানা পোকার আক্রমনে উদ্ভিদ শূণ্য হচ্ছে এখানকার বাস্তুতন্ত্র।

তাছাড়া সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের অংশ বোঁচা হাঁস, প্যাচা, গাঙচিল, কুরা, গয়ের, সাদা ঈগল, হটটিটি, হারগিলে, মদনঢাক, বাঘাবক, মাছরাঙা প্রভৃতি সব পক্ষী সম্পদ অবলুপ্তির আশঙ্কার তালিকায় স্থান লাভ করেছে। এছাড়াও অবলুপ্তির পথে পা রেখেছে শেয়াল, বড়বেঁজি, খটাস, বানর, সজারু, বনবিড়াল, নুঙ্গা ইত্যাদি সব প্রাণী সম্পদ।

সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রকে ঘিরে স্বাভাবিক কারণে থাকে নানান সব উদ্দীপনা-উন্মাদনা-কৌতুহল। আরও সব কিছুকে ঘিরে যার অবস্থান সেই ম্যানগ্রোভ অরণ্যের মনমুগ্ধকর সৌন্দর্যের জীবন্ত এক আতঙ্ক হল বাংলার বাঘ। যিনি সারা বিশ্ববাসীর নিকট রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার নামে সমধিক পরিচিত। সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রকে ঘিরে এই প্রাণীর বিচরণ বাঁচিয়ে রেখেছে সুন্দরবনের বাস্তুরীতি বা ইকোসিস্টেমকে। সেই বাঘের সংখ্যা সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রে খুবই নগণ্য। সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের এই প্রাণী সম্পদের বিলুপ্তির নানান কারণ রয়েছে। মানুষের আগমনই সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের পরিবর্তন সাধিত করেছে। ধ্বংস করেছে বাঘের সংখ্যা। নামিয়ে এনেছে অবলুপ্তির পথে। এর শিকড় অবশ্য অতীতে রোপণ করা হয়েছিল। সুন্দরবনের জঙ্গল হাসিল করে আবাদ তৈরির প্রথম পরিকল্পনা গ্রহণ করেন ২৪ পরগণা জেলার কালেকটর জেনারেল মিঃ ক্লড

রাসেল। যে কারণে আবাদ ভূমির সম্প্রসারনের হাতে পড়ে শুরু হল জঙ্গল হাসিল এর কাজ। শুরু হল শহর পত্তনের কার্যকলাপ। শহর গড়ার মহাযজ্ঞে সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রে ভীড় জমল মানব সম্পদের। মজুরদের ওপর দায়িত্ব বর্তালো বাঘ নিধন ও কুমীর নিধনের মহান কার্যকলাপের। কাঠুরে মজুরদের বন্দুক ধরার সাধ্যি ছিল না। তারা বাঘ মারত দা কুড়াল বল্লম দিয়ে। এর জন্য পুরষ্কারও পেত তারা। তাছাড়া সাহেব শিকারীরা বন্দুকের সাহায্যে বাঘ মারতে পারলেই উপযুক্ত পারিশ্রমিক পেতেন সরকারের কাছ হতে।

সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের এই প্রাণীটি যে আজ তার অবলুপ্তির পথে নিজেকে দাঁড় করিয়েছে তা কিন্তু নয়। ইতিহাসের পাতায় অনেক আগে থেকেই রাজা-সম্রাটদের হাতে নিহত হয়ে বিপন্ন প্রজাতির দলে সে নাম লিখিয়েছে। পরিসংখ্যানে দেখা যায় ১৯২৭ সাল নাগাদ ভারতবর্ষের বাস্তুতন্ত্রে বাঘের সংখ্যা ছিল প্রায় ৪০,০০০ এর কাছাকাছি। বর্তমানে তা ক্রমশ ক্রমহ্রাসমান হয়ে ৩,৫০০টিতে এসে উপস্থিত হয়েছে। বাঘের দুর্দশার কথা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বনবিভাগের আধিকারিক গোপাল চন্দ্র তাঁতী "সুন্দরবনের বাঘ ও মানুষ" প্রবন্ধে অনেক ঐতিহাসিক সব তথ্য নিবেদন করেছেন। মোগল আমল থেকে শুরু করে ব্রিটিশ আমল পর্যন্ত যে সমস্ত ব্যাঘ্র হত্যাকারীদের নাম ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হয়েছে নিম্নে সারণিতে তা দেওয়া হল-

১। মোগল সম্রাট বাবর নির্বিচারে বাঘ শিকার করেছেন।

২। জাহাঙ্গীর ৮৭ টি বাঘ শিকার করেছেন।

৩। নূরজাহান (১ লক্ষ টাকার ব্রেসলেট উপহার পেয়েছিলেন) ৪ টি ব্যাঘ্র মেরে।

৪। ডব্লু. রাইস (শ্বেতাঙ্গ রেলওয়ে অফিসার) ১৫৮ টি বাঘ নিধন করেন।

৫। আর. গর্ডন কানিং (ব্রিটিশ শিকারী) ৮৩ টি বাঘ মেরেছেন।

৬। বি. সাইমন (ব্রিটিশ শিকারী) ৬০০ টি বাঘ মেরেছেন।

৭। কর্নেল নাইটিঙ্গেল (ব্রিটিশ শিকারী) ৩০০ টি বাঘ মেরেছেন।

৮। মন্টেগুয়ে জিরার্ড (ব্রিটিশ শিকারি) ২২৭ টি বাঘ নিধন করেছেন।

৯। স্যার গুর্ডার মহারাজা ১১৫০ টি বাঘ মারেন।

১০। যাতে সিং ১০০০ টি বাঘ মারেন।

১১। মাধো রাও সিন্ধিয়া ৮০০ টি বাঘ শিকার করেন।

১২। গুলার সিং ৬১৬ টি বাঘ শিকার করেন।

১ ৩। নৃপেন্দ্র নারায়ন ৩৭০ টি বাঘ শিকার করেন।

এই পরিসংখ্যানের[২৫] উপর নির্ভর করেই বলা যায় যে বর্তমান সময়কালেও সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্র থেকে বাঘের সংখ্যা কমছে। বাঘ গণনার পরিস্থিতির উপর একটা সন্তুষ্টি জনক পরিসংখ্যান থেকেও বঞ্চিত আমরা। ১৯৭৩ সালে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের সূচনা হয়। ১৯৭৩ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত বাঘের সংখ্যার একটা পরিসংখ্যান নীচে দেওয়া হল-

সাল	বাঘের সংখ্যা	সাল	বাঘের সংখ্যা
১৯৭৩	৫০	১৯৭৬	১৮১

১৯৭৯	২০৫	১৯৮৩	২৬৪
১৯৮৯	২৬৯	১৯৯২	২৭৭
১৯৯৬	২৭৭	১৯৯৯	২৯০
২০০১	২৪৫	২০০৪	২৭৪

সুত্রঃ- সুন্দরবন কথা, বিকাশকান্তি সাহা, পৃষ্ঠা- ৭২

সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রকে মূলত বাঁচিয়ে রাখে বাঘ। তাই বাঘের সংখ্যা কম হলে বাড়বে হরিনের সংখ্যা। হরিণ তৃনভোজী প্রাণী ফলে বন ধ্বংস হবে।

বাঘের অনুপস্থিতির কারনে বাড়বে চোরাশিকার। সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের শৃঙ্খলিত বাস্তুরীতি বিপন্ন হবে। যার প্রভাবে মনুষ্য সম্পদও তাদের জীবন বাঁচাতে ব্যর্থ হবে। কেবলমাত্র বাঘ নয় মানুষের আগ্রাসনে সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্র থেকে হারিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী। তারমধ্যে গন্ডার, বুনোমোষ, স্বর্ণ মৃগ উল্লেখযোগ্য। বিপন্ন প্রায় প্রজাতির মধ্যে মোহনার কুমীর, মেছো কুমীর, অলিভ কাঠা, বাটাগুর, গোসাপ, ময়াল সাপ,সামুদ্রিক কচ্ছপ ইত্যাদি। পাখিদের মধ্যে সারস, মদনঢাক, শকুন, কাক, চড়াই, কাস্তেচোরা, সামখোল, শালিক, বাটাং এবং সাদা মাছরাঙা ইত্যাদি।

সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের ক্রমবিবর্তন ধারাতে যে সমস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদ বিলুপ্ত হয়ে গেছে প্রকৃতিতে ফিরে আসবে কিনা বলা খুবই কঠিন। এভাবে পরিবর্তন হলে সুন্দরবন তথা গভীর অরণ্যের শৃঙ্খলাও বিলুপ্তির পথে যাবে। নানান প্রাণী সম্পদের মধ্যে সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রে হাতির উপস্থিতির কথা প্রত্ন-ইতিহাসে পাওয়া গেলেও কঙ্কাল ছাড়া সুন্দরবনে জীবন্ত হাতির কোনো

অস্তিত্বই বর্তমান নেই। তাছাড়া সুন্দরবনের দক্ষিণ উপকূল অঞ্চলে জাভা গন্ডারের মতো খানিকটা দেখতে ছোটো আকারের গণ্ডার আর দেখা যায় না। উনিশ শতকের প্রথম দিকে শেষ গন্ডারটিও শিকারির হাতে প্রান দিয়েছে। সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের পূর্ব প্রান্তীয় জঙ্গলে ৭-৮ ফুট লম্বা শিং-ওয়ালা বন্য মহিষ দেখতে অনেকটা মোষের মতো, উনিশ শতকের আশির দশকে সে বেচারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এছাড়া ডোরাহীন লালচে রঙের কুকুর হরিণ, ছোট সম্বরের মতো দেখতে বার শিভা এখন বিলুপ্ত। সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্র তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও ডুগং, ঘড়িয়াল কুমির পাওয়া যাবে না। বর্তমানে বিলুপ্তির পথে অলিভ রিডলে কাঠা, বাটাগুর কচ্ছপ, মার্গার কুমির, লোনাপানির কুমির, কালোকাছিম, অজগর, কেউটে, গোখরো, চন্দ্রবোড়া ইত্যাদি।

বছর চল্লিশ আগেও সুন্দরবনে গভীর বাস্তুতন্ত্র জুড়ে তামাক-তুলা-পাট-তিল-বালি চাষ হত। এখন এগুলোও বন্ধ হয়ে গেছে। ঘর-গৃহস্থালির প্রয়োজন ভিত্তিক সমস্যা পূরণের স্বার্থে সামান্য কিছু পাট চাষ হয়ে থাকে। বিগত শতাব্দীর দুই-র দশকেও সুন্দরবনে পশম চাষ হয়েছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৩২ সালের ডিসেম্বর মাসে গোসাবায় এলেন, তখন হ্যামিলটন সাহেব তাঁকে সুন্দরবনের পশমের তৈরি সাল উপহার দিয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তুতন্ত্রের ক্রমবিবর্তনের ধারায় সে সব কিছু আজ বিলুপ্তির পথে।

গভীর বাস্তুতন্ত্রের সম্পদ চিংড়ি, কাঁকড়া, হাঙর, কামোট ইত্যাদি বর্তমানে লাভজনক এক ব্যবসাতে দাঁড়িয়েছে, তাছাড়া আন্তর্জাতিক বাজারেও এদের চাহিদা উল্লেখযোগ্য। সেকারণেই সুন্দরবনের বিভিন্ন জায়গায় তৈরি হয়েছে কৃত্রিম ভেড়ী। ফলে বাগদা-ভেটকি-ভাঙন-পার্শের লাভজনক ব্যবসার চাহিদায় এবং মানুষের অসচেতনতায় মিষ্টি জলের ও নোনাজলের মাছ, মাছের ডিম ও পোনা, মীন এবং বিভিন্ন প্রজাতির আণুবীক্ষণিক প্রাণী আজ বিলুপ্ত হতে বাধ্য।

সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের অংশ হিসাবে মানব সম্পদ উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিনিয়ত লড়াই করছে সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রে বেঁচে থাকার জন্য। তাছাড়া তারা খুব পরিশ্রমী। নানান কাজের মধ্যেও এরা নানান পেশাকে জীবিকা হিসাবে বেছে নিয়েছে। অনেকেই নদীর মাছ ধরে জীবন কাটায়, আবার অনেকেই মীন ধরে। এতে কি হয় নদী-সমুদ্রের মৎস্য সম্পদ যেগুলি প্রয়োজন, বাকীরা নষ্ট হয়। ছোট ছোট মীন মাছ নষ্ট হচ্ছে। এর ফলে মাছের বংশবৃদ্ধির হ্রাসজনিত সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

ছোট মাছের মীনের সন্ধানে গিয়ে সুন্দরবনের মানুষ নদীর পাড়ের ছোট ছোট ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের ক্ষতি করছে। নদী বাঁধের ক্ষতি করছে। সব মিলিয়ে মানুষের সচেতনতার অভাবে বিলুপ্ত হচ্ছে সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের সম্পদ। সুন্দরবনকে বাঁচানো বা সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখার চিন্তা ভাবনা যে আমার মতো গবেষক করছে তাও কিন্তু নয়। বিশ্বের দরবারেও এসবের একটা সমীক্ষা, একটা বাতাবরন তৈরির চেষ্টা চলছে। ধরিত্রীর বুকে যে বাস্তুতন্ত্র রচিত হয়েছে এবং সেখানেও যে বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীও উদ্ভিদের বিলুপ্তি হচ্ছে না তাও কিন্তু নয়। জাতিসঙ্ঘের রোমভিত্তিক খাদ্যসংস্থা এফ.এ.ও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বলেছেন প্রতিটি সপ্তাহে কমপক্ষে দুটি প্রজাতির পশু-প্রাণী পৃথিবীর বুক থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া তাদের রিপোর্টে বলছেন এইভাবে ১৩৫০ টি প্রাণী আজ বিলুপ্তির পথে। তাঁদের মতে সাধারণত যেগুলি খামারে পালিত হয়, অর্থাৎ কিনা খামার প্রাণী।

জাতিসংঘের এই সংস্থার মতে বিগত ২৫ বছরে ৩০০ প্রজাতির পশু-প্রাণী হারিয়ে গেছে পৃথিবী থেকে। কেবলমাত্র খামার প্রাণী নয় বিলুপ্তির পথে পা রেখেছে বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদও। তাঁদের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিশ্বে মানুষ ১০ হাজার প্রজাতির উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণা করতো, কাজ

করতো, সেই সংখ্যাটা আজ ১১২০ তে এসে দাঁড়িয়েছে। এদের পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসাটা খুবই মুশকিল। নানান গবেষণা ও কৃত্রিম প্রজনের প্রচেষ্টার দিকেই আমাদের নজর রাখতে হবে, যদি কিছু মিরাক্কেল ঘটে। সুন্দরবন ব-দ্বীপ এলাকা। প্রতিটি বদ্বীপ একে অন্যের সঙ্গে নদীর দ্বারা সংযুক্ত। কোথাও সরু নদী আবার কোথাও চওড়া। এই ভাবে সজ্জিত সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের বদ্বীপ সমূহ। সুন্দরবনবাসী তাদের জীবন ধারনের জন্য মৎস্য সম্পদ সংগ্রহকে অধিক কার্যকরী ও ইতিবাচক দিক বলেই মান্যতা দেয়।

সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রে নদী-খাড়ি বা নদী মোহনায়, সুন্দরবনের মৎস্যজীবি সম্প্রদায় অর্থের উপার্জনের কারণে বিভিন্ন প্রকার মাছ ধরার জাল ব্যবহার করে। সেখানে নদী-সমুদ্রের বিভিন্ন প্রকার, বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ধরা পড়ে। বেন্টি জাল, খ্যাপলা জাল, ইলিশ ধরা জাল, কলসি জাল, আটন জাল ইত্যাদি ব্যবহার করে মৎস্য তুলে আনে নদীর গভীর থেকে। এতে বেশ কিছু প্রজাতির মাছ বিলুপ্ত হয়েছে। মৎস্য জীবিদের মতে বিশ্বে ৩০ হাজার প্রজাতির মধ্যে ২০ হাজারের ১১ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গে। পরিবেশ মন্ত্রক রেসলোকার, স্পারিহাল প্রভৃতি ৫০ প্রজাতির মাছ ধরার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। এছাড়াও পাবদা, ভেদা, চিতল, পাঙ্গাশ, খয়রা, শোল, বোয়াল, সিঙ্গি, মৌরলা, পাঁকাল, কই ইত্যাদি প্রায় ৪০ প্রজাতির নোনা মিঠে মাছ আজ লুপ্ত প্রায়। এছাড়াও নদী খাড়িতে বাগদার মীন ধরার জন্য বিভিন্ন প্রকার উন্নত মানের জাল ব্যবহৃত হয়। যেমন- নেট জাল, পিপ জাল, আড় জাল, বাঁশ জাল, চরপাটা প্রভৃতি। এভাবেও হারিয়ে যাচ্ছে সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের মৎস্য সম্পদ। বকিল্প কছিুর ব্যবস্থা না থাকলওে এর সমাধান সম্ভব নয়। বাগদার মীন বাঁচানোর যে চেষ্টা তা কার্যকরী হচ্ছে না। "ওই যে সব নাইলন জাল চালু হয়েছে এখন। চিংড়ির মীন মানে বাগদা

চিংড়ির পোনা-ধরে ওতে করে। জালের ফুটো গুলো এত ছোট যে তাতে মীনের সঙ্গে অন্য সব মাছের ডিম ও উঠে আসে''[২৬]।

মানুষের সীমাহীন লালসা ও হনন প্রবৃত্তি গভীর বাস্তুতন্ত্রের শৃঙ্খলাকে ধ্বংস করেছে। মনুষ্য সমাজের কৃতকর্মের ফলশ্রুতি হিসাবে বাংলা বা বাংলাদেশ থেকে ঋতুর অবলুপ্তি ঘটেছে। গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ-শীত নিয়ে প্রচন্ড চরমভাবাপন্নের মধ্যে সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের প্রকৃতি বিরাজ করছে। একটা ঋতু যদি তার সময়কালের থেকে একটু বেশি কনফিডেন্স দেখায় তবে অন্য ঋতুর পরমায়ু সংক্ষিপ্ত আকার ধারন করে।

তাছাড়া জলে লবণের মাত্রা হ্রাস-বৃদ্ধির অসমতা, জলবায়ুর তারতম্য, নদীর নাব্যতা হ্রাস, জীবজন্তুর খাদ্য-খাদ্যকতা ও বিচরণ ক্ষেত্রের সংক্ষিপ্তায়ন, ব্যাপক যন্ত্রযানের তেল ও শব্দ দূষণ জনিত অত্যাচার, জনবিস্ফোরন, শিল্পের নামে, নগরায়নের নামে এবং চোরাগোপ্তা আক্রমন ও যথেচ্ছ শিকার প্রভৃতি কারণে আজ বাস্তুতন্ত্র বিপন্ন। এছাড়া প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ঝড়-ঝঞ্ঝা ও এই ক্রম বিবর্তনের ধারাতে যুক্ত হয়েছে। ফলে উদ্ভিদ জগৎ ও প্রাণী জগৎ ও প্রায় সম্পূর্ণ বিপন্ন। আবার বেশ কিছু বিলুপ্তির পথে। শেষ প্রাকৃতিক বিপর্যয় বলতে ২০০৯ সালের মে মাসে 'আয়লা' যে ভয়ংকরতা দেখিয়েছে তাতে বেশ ভয়ংকর ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ সুন্দরবন সহ সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্র। এই আইলা গোটা সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পঙ্গু করে দিয়েছে। সম্পদের ওপর ভীষণভাবে সংকট তৈরি করে এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়।

নিম্নে সুন্দরবন অঞ্চলে ৪০০ বছরে ঘুর্নিঝড়ের একটি তালিকা দেওয়া হল-

সাল-সংখ্যা	সাল-সংখ্যা	সাল-সংখ্যা

১৫৮২-১	১৮৯৬-৫	১৯৪৩-১
১৬৮৮-১	১৮৯৮-৪	১৯৪৮-১
১৭০৭-১	১৮৯৯-১	১৯৫৬-১
১৭৩৭-১	১৯০০-১	১৯৬০-১
১৭৪২-১	১৯০১-৪	১৯৬১-১
১৮৩০-১	১৯০৪-২	১৯৬২-১
১৮৩২-৩	১৯০৭-২	১৯৬৫-১
১৮৩৩-১	১৯০৯-১	১৯৬৬-১
১৮৩৯-১	১৯১৩-২	১৯৬৮-১
১৮৪০-১	১৯১৬-২	১৯৭০-১
১৮৪৪-১	১৯১৭-১	১৯৭৩-১
১৮৪৮-১	১৯১৯-১	১৯৮১-১
১৮৫০-১	১৯২২-১	১৯৮২-১
১৮৫২-১	১৯২৭-১	১৯৮৫-১

১৮৫৮-১	১৯২৮-১	১৯৮৮-১
১৮৫৯-২	১৯২৯-১	১৯৯১-১
১৮৬২-১	১৯৩২-১	১৯৯৪-১
১৮৬৪-১	১৯৩৪-১	২০০৩-১
১৮৬৭-১	১৯৩৫-১	২০০৭-১
১৮৭৭-৩	১৯৩৬-১	২০০৯-১
১৮৮৯-২	১৯৩৭-১	২০১০-১
১৮৯৩-২	১৯৪০-১	
১৮৯৪-১	১৯৪১-১	

সুত্রঃ- সুন্দরবন কথা, বিকাশকান্তি সাহা, পৃষ্ঠা- ৮০

বিগত এই ৪০০ বছরে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ে সুন্দরবন ১০৪ বার বিপর্যস্ত, ১৭৩৭ সালে কেবলমাত্র ৩ লক্ষ মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়ে। তাছাড়া বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী এর কারণেও সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্র থেকে বিলুপ্তির পথে চলে যায়। ভয়াবহ বন্যাও সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রকে নানা ভাবে বিপর্যস্ত করেছে। নিম্নে একটা বন্যার তালিকা দেওয়া হল।

সুন্দরবন অঞ্চলে বন্যার তালিকা-

সাল	বন্যার সংখ্যা	সাল	বন্যার সংখ্যা
১৭৭০	১	১৮৩২	১
১৮৩৪	১	১৮৫৬	১
১৮৬৪	১	১৮৬৮	১
১৮৬৯	১	১৮৭১	১
১৮৮৫	১	১৮৯০	১
১৯০০	১	১৯০৭	২
১৯৬৬	১	১৯৭৬	১
১৯৭৮	১	মোট------	১৬ বার

সুত্রঃ- সুন্দরবন কথা, বিকাশকান্তি সাহা, পৃষ্ঠা- ৮১

কেবলমাত্র মানুষ নয়, নানান ভাবে নানান কারণে সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্র থেকে ক্রমাগত হারাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের সম্পদ। মূলত বাস্তুতন্ত্র থেকে ম্যানগ্রোভ ধ্বংস হচ্ছে বলেই প্রাকৃতিক সম্পদের ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে। যে কারণে বিপন্ন ও বিলুপ্তির পথে নিম্ন লিখিত প্রাণী ও উদ্ভিদ সম্পদ।

সুন্দরবনের বিলুপ্ত বন্যপ্রাণ

ইংরেজী নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	বাংলা নাম
SwampDeer	Cervas duvanceli	জলাভূমির হরিণ
Wild Buffalo	Bubalus bubalis	বন্য মহিষ
Lesser one horned Rhineceros	Rhinoceros sondatcus	ছোট এক শিং গন্ডার
Onehorned Rhinoceros	Rhinoceros unicornis	এক শৃঙ্গ গন্ডার
Barking deer	Muntiacas munjjck	কুকুর হরিণ
Hog deer	Axis porchines	হরিণ

সুন্দরবনের বিপন্ন বন্যপ্রাণ-

ইংরাজী নাম	বৈজ্ঞনিক নাম	বাংলা নাম
Royal Bengal Tiger	Panthera tigris tigris	বাঘ
Fishing cat	Felis viverrina	মেছো বিড়াল
Gangetic Dolphin	Platenista gangeticus	শুশুক
Smooth Indian otter	Lutra perspicillats	ভোঁদড়

Irrawady Dolphin	Orcaella bievirestris	শুশুক
Finless Porpoise	Neophocaena phocaenoides	শুশুক
Bat	Megaderma spasma	বাদুড়
Fox	Vulpes bengalensis	খেঁকশিয়াল
Mongoose	Herpostes edwardai	বেজি
Jungle cat	Felis cans	বনবিড়াল
Civet	Viverricula Indica	গন্ধগোকুল

সুত্রঃ- সুন্দরবন কথা, বিকাশকান্তি সাহা, পৃষ্ঠা- ৭৫

অমেরুদণ্ডীঃ

ইংরাজী নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	বাংলা নাম
Horseshoe crab	Linulus polyphenus	সাগর কাঁকড়া
Sea crab	Liocarcinus vernalis	সাগর কাঁকড়া
Sea anemone	Actinaria sp.	সাগর কুসুম
Limuis	Linulus polyphenus	সাগর কাঁকড়া

সুত্রঃ- সুন্দরবন কথা, বিকাশকান্তি সাহা, পৃষ্ঠা- ৭৭

সরীসৃপ-

ইংরাজী নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	বাংলা নাম
Estarine crocodile	Crocodilus porosus	নোনা জলের কুমির
Marsh crocodile	Gravelius gangeticus	মেছো কুমির
Olive Ridley Turtle	Lepidochelys olivacea	অলিভ কাঠা
River Terrapim	Batagur baska	বাটাগুর কাঠা
Indian Roofed turtle	Kachuga tecta	কড়ি কাঠা
Water Monitor	Varanus salvator	গোসাপ
Green Turtle	Chelonia mydas	সবুজ সামুদ্রিক কচ্ছপ
Narrow headed soft shell turtle	Chetra indica	সমুদ্র কাঠা
Indian Python	Python molurus	ময়াল, অজগর
Tokay Gecko	Gecko gecko	তক্ষক

সুত্রঃ- বিকাশকান্তি সাহা, সুন্দরবন কথা, প্রিস্থা-৭৬

মাছঃ-

ইংরাজী নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	বাংলা নাম
Pabda catfish	Ompok pabda	পাবদা
Clown knifefish	Notopterus chitaba	চিতল
.....	Gudusia bacaila	খয়রা
Climbing perch	Andus tertudenius	কই
Golden catfish	Mystus tangram	ট্যাংরা
Stripled gourami	Colisa tasciatus	খলসে
.....	Nandess nandess	ন্যাদস
Spotted snakehead	Channa puactatus	ল্যাঠা
Hilsa	Hilsa ilisa	ইলিশ

উল্লেখ করা যেতে পারে বর্তমান নোনা ও মিঠে জলের ৪৯ প্রজাতির মাছ অবলুপ্ত প্রায়।

সূত্রঃ বিকাশকান্তি সাহা, সুন্দরবন কথা, পৃষ্ঠা- ৭৬

পাখিঃ

ইংরাজী নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	বাংলা নাম
Brown fish owl	Ketupa zeloneusis	প্যাঁচা
Stone curlew	Burhinus oedienemus	হাটিটি
White bellied sea eagle	Heliacestus leucogaster	সাদা ঈগল
Brown headed Gull	Larus brumnicephalus	গাঙচিল
Crow pheasant	Centropus sinensis	কুকা বা কুকো
Darter Auhinga ruta	Anhinga anhinga	গয়ের
Goliath heron	Ardea goviath	বাঘা বক
Adjutant stork	Leptoptilas dubius	হাড়গিলে
Lenssr Adjutant stork	Leptoptilos javanicus	মদাটাক
Rudy kingfisher	Halcyon coromanda	লাল মাথা মাছরাঙা
Vulture	Aegypius monachos	শকুন

সূত্রঃ বিকাশকান্তি সাহা, সুন্দরবন কথা, পৃষ্ঠা -৭৭

সুন্দরবনে বিপন্ন ম্যানগ্রোভঃ

বৈজ্ঞানিক নাম	স্থানীয় নাম
Nypa fruticans	গোলপাতা
Kandelia candel	গড়িয়া
Scyphiphora hydrophyllcca	টগরীবালী
Alalantia correa	বনলেবু
Acanthus volibilis	লতাহরগোজা
Brownlowia lancolats	লতাসুন্দরী
Lumnitzxera racamosa	কৃপা
Xylocurpus nekongenesis	পশুর
Tylophora tennis	কাউফল
Sonneratia griffit	ওড়া
Aglaia cucullata	আমুর
Rhizophora apiculata	গর্জন

Bruguiera sexanghla	কাঁকড়া
Aelupus legopoides	নোনা দূর্বা
Barringonia acutangula	হিজল
Canavalica cathartica	বড়সীম
Cissus triplia	অমললতা
Darris india	করঞ্জ
Diospyros ferrea	বুনোগাব
Excoecaria bicolas	গেঁওয়া
Flacourtia indica	বৈচি
Solanum trilobathus	লতা বেগুন
Thevetia peruviana	কলকে ফুল
Heritiera fomes	সুন্দরী
Heritiera littoralis	সুন্দরী

সুত্রঃ- সুন্দরবন কথা, বিকাশকান্তি সাহা, পৃষ্ঠা- ৭৮

সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের প্রেক্ষাপটে সুন্দরবনের অরণ্য আইনঃ

আলোচনার সুবিধার্থে প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো যে বাস্তবিকই সুন্দরবনের জন্য আলাদা করে কোন আইন তৈরি হয়নি বা রচনা করা হয়নি। সুন্দরবনকে ঘিরে যা কিছু ভালো, যা কিছু মন্দ ভাবনা তা বিভিন্ন সংস্কার দ্বারা সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের শ্রীবৃদ্ধি ঘটানোর চেষ্টা হয়েছে। কার্যকরী বিভিন্ন উন্নয়ন দ্বারা সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্র ও বাস্তুতন্ত্রে বসবাসকারী মানব সমাজের উন্নতিতে সহায়তা দান করা হয়েছে। সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রকে নিয়ে বর্তমানে অনেক ভাবনা চিন্তা হয়েছে বা চলছে। কারণ বিশ্ববাসী আজ নানান সমস্যার মধ্যে পড়ে গিয়ে অরণ্যের উপযোগিতাটা অনুধাবন করতে পেরেছে।

সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রকে ধ্বংস করার কাজ ঔপনিবেশিক আমল থেকে শুরু হয়েছে বলে আমার মনে হয়। কারণ ১৮৫৩ সালে ভারতে রেলপথ সম্প্রসারনের কাজ শুরু হয়। বম্বে থেকে থানে পর্যন্ত প্রথম রেলপথ তৈরি হয়ে, রেল চলতে শুরু করে। সেখানে রেলপথের সম্প্রসারনের জন্য ব্যবহার করা হত কাঠের স্লিপার। স্লিপার গুলে অধিকাংশই আসতো শাল, সেগুন কিংবা অরণ্যের মধ্যেকার নানা দামী বৃক্ষ ছেদন করে। তাতে যেমন গভীর অরণ্যের বাস্তুতন্ত্রে ভারসাম্য আঘাতপ্রাপ্ত হতো, তেমনই ভাবে অরণ্যের সাথে যুক্ত মানুষদেরকে ও সমস্যায় পড়তে হতো। ভারতে অরণ্য আইন তৈরির পশ্চাতে ব্রিটিশদের সাম্রাজ্যবাদী নীতি কাজ করেছিল। তাছাড়া অরণ্যের সঙ্গে যুক্ত মানব সমাজ তথা কোল, ভিল, মুন্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতি সব আদিবাসী মানুষের জীবন, তা অরণ্যের বাস্তুতন্ত্রের সম্পদ দিয়েই পরিপূর্ণতা লাভ করতো। যখন কাঁচামাল সংগ্রহ ও বনজ সম্পদ সংগ্রহের ওপর ব্রিটিশদের ঝোঁক বাড়ল, তখন বিঘ্নিত হলো বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য, বিঘ্নিত হলো অরণ্যের অধিবাসীদের স্বার্থ।

অনেক আন্দোলন, অনেক প্রতিবাদের চিহ্ন আমরা ইতিহাস থেকে জানতে পারি। প্রজা বিদ্রোহের দমনের দানবীয় চেহারা কি হতে পারে তার প্রত্যক্ষ স্বাক্ষী ভারতীয় ইতিহাস। অত্যাচারিত এইসব মানুষজন নতুন আশ্রয়ের সন্ধানে ভীড় জমিয়েছে সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের অরণ্য সম্পদ সংগ্রহের মতোই যেন অযাচিত ভাবেই ব্রিটিশদের সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের দিকে নজর পড়েছিল। তাই জঙ্গল হাসিলের হাত ধরে আবাদভূমির সম্প্রসারণ হয়েছিল। মানুষের স্রোত এসে জমায়েত হয়েছিল সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রে। এতে যদিও বেশি পরিমান রাজস্ব আদায়ের প্রচেষ্টায় ছিল ব্রিটিশ সরকার। ১৭৯৩ এর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও কিন্তু আস্তে আস্তে করে সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রকে ঘিরে ধরেছিল। সেইমতো নতুন নতুন নীতির দ্বারা সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রচেষ্টায় রত হয়েছিল ব্রিটিশ সরকার। অরণ্যের ওপর হস্তক্ষেপ করাটা ব্রিটিশ সরকার অরণ্য আইন তৈরি করেই কার্যসিদ্ধি করেছিল। প্রি-কলোনিয়াল সময়কালে যতই কাস্ট এবং ক্লাস এর মধ্যে একটা পৃথকীকরণ থাকুক না কেন, সেখানে সবকিছুর মধ্যে একটা বিধিসম্মত সুসামঞ্জস্য ছিল। কৃষি, শিল্প, রাজ্য-কৃষক, এদের মধ্যে একটা পারস্পারিক সম্পর্ক ও সংযোগ ছিল। যেটা এখন বিরোধের পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে। এটার পরিবর্তন এলো ষোড়শ শতকে। যখন ইউরোপ জুড়ে নেমে এসেছিল শিল্প বিপ্লবের জোয়ার। ভারত যুক্ত হচ্ছে তখনই যখন ইউরোপে শিল্পবিপ্লব হবে হবে করছে। শিল্পের জন্য দরকার প্রচুর পরিমানে সম্পদ, এবং দরকার একটা বাজার। যে কারণেই ব্রিটিশ কলোনাইজাররা ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর বেশি পরিমানে মনোনিবেশ করলো। তার থেকেই শুরু হল সাম্রাজ্যবাদ। এই ঔপনিবেশিকতাটাই ভারতীয় বাস্তুতন্ত্রের একটা বিশাল ধ্বংসের জায়গা তৈরি করেছে। ১৮৬৪ সালে তৈরি করা হচ্ছে ইমপেরিয়াল ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট। কারণ অবশ্য বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে আরও বেশি বন্য সম্পদ আহরণ করা। আসলে বন ধ্বংস করা। যাতে

ডিপার্টমেন্টটা ঠিক ভাবে চলতে পারে সেকারণেই আইন বলবৎ করা হল। ভারতীয় অরণ্যের বাস্তুতন্ত্রের ওপর ব্রিটিশ শক্তির একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য খুবই দ্রুততার সাথে ১৮৬৫ এর অরণ্য আইন তৈরি করা হয়েছিল। আইনত স্টেটের একটা নিয়ন্ত্রন রয়েছে অরণ্যের ওপর। কিন্তু সেই আইনকে আরও জোরালো ও আরও কঠিন করতে নিজেদের মধ্য থেকে দাবি উঠতে থাকে। এই দাবির জোরালো সমর্থনে তিনটি দল তৈরি হয়[২৭]। ১। অ্যানেক্সস্নিস্ট, এদের বক্তব্য যে ভারতের প্রতিটি অরণ্যের ওপর রাষ্ট্রের পুরো অধিকার থাকবে। ২। প্রাগ্মাটিক, এদের বক্তব্য যদিও আত্মকেন্দ্রিক, কিন্তু একটা ভারসাম্যের কথা বলে। এদের মতে ভারতীয় অরণ্যের বাস্তুতন্ত্রের যে জায়গাগুলো স্পর্শকাতর অর্থাৎ কিনা যাদের জীবন বনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে সেই আদিবাসী মানুষ এবং ভৌগলিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ সেই সব এলাকার উপর নিয়ন্ত্রনের কথা এরা বলেছেন। অর্থাৎ ব্রিটিশদের কাছে যেগুলি মূল্যবান সেগুলো স্টেট ম্যানেজ করবে। বাকী যে অংশ গুলো থাকবে, সেগুলোতে গোষ্ঠীর মধ্যে অংশীদারিত্ব করার অধিকার দেওয়া হবে। ৩। পপুলিস্ট, এদের মতে রাষ্ট্রের বা স্টেটের কোনো নিয়ন্ত্রন থাকবে না জঙ্গলের ওপর। যেহেতু কৃষক ও আদিবাসীরা অরণ্যের মূল সম্পদ তাই তাদের হাতেই থাকবে অরণ্যের অধিকার।

১৮৬৫-র অরণ্য আইন তৈরি হয়েছিল, মূলত ব্রিটিশ শক্তির সুবিধার্থে। কারণ ইউরোপের শিল্প বিপ্লবের হাতে পড়ে নিজেদের কারখানা গুলোতে বেশি করে সম্পদের যোগান দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া রেলপথের বিস্তার সেই সম্পদ আরও কাছাকাছি আনতে সহায়তা দান করবে। রেলপথের সম্প্রসারনের জন্য দরকার স্লিপার, যেগুলো আসতো অরণ্য নিধনের কাজ করে। অরণ্যজীবি মানুষদের অধিকার ধ্বংস করতে এবং ব্রিটিশ শক্তির একাধিপত্যের বিস্তারের জন্যই এই আইন তৈরি করে ছিলেন কলোনাইজাররা। “The 1865 act was passed to facilitate the

acquisition of those forest areas that were earmarked for railway supplies"[২৮] এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে ১৮৬৫ এর অরন্য আইন তৈরির পশ্চাতে রেলে একটা বড় ভূমিকা ছিল।

১৮৭৮ এর অরণ্য আইন চালু হয়ে ছিল ১৮৬৫ এর আইন চালু হবার ১৩ বছর পর। যদিও অনেক বাধা-প্রতিবন্ধকতার পর এই আইন কার্যকরী করা হয়েছিল। এই আইনের মাধ্যমে পরিত্যক্ত এলাকা কঠোরভাবে স্টেট এর আওতায় চোলে আসে। ১৮৭৮ এর এই অরণ্য আইনের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল।

আইনটি তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে অরণ্যের স্বার্থে আঘাত সৃষ্টি করেছিল। আইনের তিনটি বিভাগ হল- প্রোটেক্টেড ফরেস্ট, রিজার্ভড ফরেস্ট, ভিলেজ ফরেস্ট। অরণ্যকে উপরিলিখিত তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করার পেছনে ব্রিটিশদের উদ্দেশ্য ছিল স্টেট কন্ট্রোল আরও দৃঢ় করা। মূলত ১৮৭৮ এর অরণ্য আইন কার্যকরী করার উদ্দেশ্যই ছিল অরণ্যচারী মানুষদেরকে নিয়ন্ত্রন করা। তাছাড়া উপনিবেশিক শাসনকে আরও বেশি মজবুত করেছিল এই আইন। রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রন আরও জোরদার করতেই এই আইন তৈরি করা হয়েছিল। প্রোটেক্টেড ফরেস্টের ওপর স্থানীয় জনগণের কোন অধিকারকে স্বীকার করা হয়নি। আন্যান্য অঞ্চলের ওপর যদিও বা অধিকার দেওয়া হয়েছিল, তবে তা যে কোন সময় কেড়ে নেওয়া হত।

রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব যাতে আরও জোরালো ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তারই কারণে ১৯২৭ সালে ভারতীয় অরণ্য আইন কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে। অরণ্যচারী মানুষদের সাথে বনের যে সম্পর্ক ১৯২৭ এর অরণ্য আইন সেই সম্পর্ক নিঃশেষ করতে সচেস্ট হয়। ১৯২৭ এর এই অরণ্য আইন যে সংশোধনী আনলো তাতে দেখা গেল, অরণ্যের ওপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রন যেমন বাড়লো, জঙ্গলের ওপর আদিবাসীদের

কর্তৃত্ব ততই কমলো। আসলে অরণ্য আইন গুলো বিশ্লেষণ করলে এটা বোঝা যায় যে, রাজস্ব আদায়ের জন্য ব্রিটিশরা জমিদারদের উৎসাহিত করছে, অরণ্য সংস্কার করে কৃষি জমির পরিমান বাড়িয়ে তোলার। তার ঐতিহাসিক প্রমাণ আমরা ভারতীয় ইতিহাসের বিভিন্ন আন্দোলন গুলোর দিকে তাকালে বুঝতে পারি। কলোনিয়াল সময়কালে অরণ্যকেন্দ্রিক যে নীতি গুলি আইনে পরিণতি লাভ করেছিল তার মূল উদ্দেশ্য ছিল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের শিল্পায়ন ও বাণিজ্যিক সফলতা অর্জন। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর বনকেন্দ্রিক যে সমস্ত পলিসি বা আইন তৈরি হয়েছিল তাতে ভারতীয় স্বার্থ বজায় ছিল বলে মনে হয়। কারণ পরিবেশ বাঁচাতে হলে দরকার বনকে স্বাভাবিক রাখা, যে কারণে পরিবেশের সুস্থ স্বাভাবিক ভারসাম্য বজায় রাখতে আন্তর্জাতিক স্তরে ১৯৭২ সালে সুইডেন-এর স্টকহোম-এ বসে প্রথম আন্তর্জাতিক পরিবেশ সম্মেলন। সেখানেই ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ভাষণে ভারতীয় পরিবেশ তথা অরণ্য আইনের উপর একটা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী পরিলক্ষিত হয়। ১৯৭২-এ স্টকহোমে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রসংঘের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে ভারতে প্রণয়ন করা হয় ১৯৮৬ সালের পরিবেশ সংরক্ষণ আইন। ভারতীয় প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এই আইনটি কার্যকরী হয়। এই আইনের ৭ নং ধারা অনুসারে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান পরিবেশের গুণমান নষ্ট করতে পারবে না। ১৯৭২ এর সম্মেলন থেকে ভারতে পরবর্তী সময়ে যে সব আইন তৈরি হল তার মূল উদ্দেশ্যই ছিল বন কেটে, বা বন ধ্বংস করে নয় বন রেখে বনের মধ্যে হোক কৃষি। ফলত বন ধ্বংস নয় বনসৃজনই হবে বাস্তুতন্ত্রকে বাঁচানোর একমাত্র পন্থা। এত সব কিছুর মধ্যেও ১৯০০ সালের প্রথম দশক থেকেই কিন্তু সাগার, কাকদ্বীপ, নামখানা, পাথরপ্রতিমা, গোসাবা, প্রভৃতি জায়গাগুলতে নির্বিচারে বন ধ্বংস করে লাটদারদেরকে বন বিলি করা হয়েছে। অরণ্য আইনকে দূরে সরিয়ে রেখে সরকার ১৯৬৩ সালে বাংলাদেশ থেকে আগত রিফিউজিদেরকে বসতি

দেবার জন্য হেড়োভাঙা ও ঝড়খালি ব-দ্বীপে প্রায় ৫০০০ একর বিঘা জঙ্গল পরিষ্কার করা হয়। ফলত অরণ্য আইনের ইতিবাচক দিক ছিল ঠিকই, ইতিবাচক প্রভাব ছিল বলে মনে হয় না।

তথ্যসুত্রঃ-

১। প্রণব সরকার, চব্বিশ পরগণা ও সুন্দরবন, লোক প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা, ২০১৩, পৃ ৫৪

২। সুভাষ মিস্ত্রি, লোকায়ত সুন্দরবন, লোক প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১৩, পৃ ৬৪

৩। সুধীন সেনগুপ্ত, সুন্দরবন জীব পরিমণ্ডল, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, এপ্রিল ২০০৫, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০১২, পৃ ১৮

৪। সুভাষ মিস্ত্রি, লোকায়ত সুন্দরবন, লোক প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১৩, পৃ ৬৬, ৫৭, ৬৮, ৭৫,

৫। তদেব, পৃ ৬৪

৬। সুধীন সেনগুপ্ত, সুন্দরবন জীব পরিমণ্ডল, আনন্দ, প্রথম সংস্করণ, এপ্রিল ২০০৫, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০১২, পৃ- ১৩, ১৪

৭। শচীন দাশ, জল, জঙ্গল ও জনজীবনে সুন্দরবন, দীপ প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা জানুয়ারী ১৯৯৭, পৃ ৪০

৮। সুধীন সেনগুপ্ত, সুন্দরবন জীব পরিমণ্ডল, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, এপ্রিল ২০০৫, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০১২, পৃ ৬৮

৯। নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল, সুন্দরবনঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা-১, সমকালের জিয়নকাঠি প্রকাশন, যুগ্ম সংখ্যা, প্রথম প্রকাশ, জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৫, পৃ ২৩৮

১০। সুধীন সেনগুপ্ত, সুন্দরবন জীব পরিমণ্ডল, আনন্দ, প্রথম ও দ্বিতীয় মুদ্রণ, এপ্রিল ২০০৫ ও জুলাই ২০১২, পৃ- ১৮

১১। শচীন দাশ, জল জঙ্গল ও জনজীবনে সুন্দরবন, দীপ প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৭, পৃ- ৪২

১২। সুভাষ মিস্ত্রী, লোকায়ত সুন্দরবন, লোক প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১৩, পৃ-৯৬

১৩। তদেব, পৃ-১০০

১৪। সুধীন সেনগুপ্ত, সুন্দরবন জীব পরিমণ্ডল, আনন্দ, প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকাশ, এপ্রিল ২০০৫ ও জুলাই ২০১২, পৃ-১০৬

১৫। শচীন দাশ, জল জঙ্গল ও জনজীবনে সুন্দরবন, দীপ প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৭, পৃ-৫০

১৬। সুভাষ মিস্ত্রী, লোকায়ত সুন্দরবন, লোক প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১৩, পৃ-১০০

১৭। তদেব, ১০১

১৮। এ এফ এম আবদুল জলিল, সুন্দরবনের ইতিহাস, নয়া উদ্যোগ, প্রথম ভারতীয় সংস্করণ, ২০০০, পৃ-১০০

১৯। শচীন দাশ, জল জঙ্গল ও জনজীবনে সুন্দরবন, দীপ প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৭, পৃ-৫০

২০। সুধীন সেনগুপ্ত, সুন্দরবন জীব পরিমণ্ডল, আনন্দ, প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকাশ, এপ্রিল ২০০৫ ও জুলাই ২০১২, পৃ-৬০

২১। তদেব, পৃ-৬০

২২। পূর্ণেন্দু ঘোষ, ইতিহাসের আলোকে সুন্দরবন ও পোর্টক্যানিং, লোকসখা প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২৫ জানুয়ারি ২০১৭, পৃ- ৮৬

২৩। সুভাষ মিস্ত্রী, লোকায়ত সুন্দরবন, লোক প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১৩, পৃ- ১০৮, ১০৯

২৪। তদেব, পৃ- ১০৯

২৫। কানাইলাল সরকার, সুন্দরবনের ইতিহাস, পাণ্ডুলিপি, প্রথম প্রকাশ, ২০১৭, পৃ-১২৯

২৬। অমিতাভ ঘোষ, ভাটির দেশ, অনুবাদ অচিন্ত্যরূপ রায়, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রকাশক সুবীরকুমার মিত্র, প্রথম সংস্করণ, নভেম্বর ২০০৯, চতুর্থ মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ২০১৬, পৃ- ১১৮

২৭। Madhav Gadgil, Ramchandra Guha, This Fissured Land, An Ecological History of India, Oxford University Press, New Delhi, 1992, p-124

২৮। Ibid, 123

দ্বিতীয় অধ্যায়

সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্র ও সুন্দরবনবাসীর উপরে তাঁর প্রভাব।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ ও সুবিস্তৃত ম্যানগ্রোভ অরণ্যের আবাসভূমি সুন্দরবন। সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের সম্পদ, ম্যানগ্রোভ অরণ্যের জন্য সংরক্ষিত ভূ-ভাগের মোট আয়তন ১০,০০০ বর্গকিলোমিটার, তার মধ্যে ৬০০০ বর্গ কিলোমিটার পড়ে বাংলাদেশের ভাগে, আর বাকি অংশটা পড়ে ভারতবর্ষের ভাগে। বঙ্গোপসাগরের বুকে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীর মহাসঙ্গম দ্বারা নির্মিত বিস্তীর্ণ ব-দ্বীপ জুড়ে সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের অরণ্যের বিস্তার। গোটা অঞ্চলটিকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করেছে বিভিন্ন জোয়ার-ভাটাসম্পন্ন খাল, চর ও ম্যানগ্রোভ অরণ্যের ছোট-ছোট দ্বীপের বিস্তৃত জাল। ম্যানগ্রোভ অরণ্যের বৃহত্তম দ্বীপটির নাম সুন্দরবন হয়েছে সুন্দরী গাছের নামে এবং সুন্দর, মনোমুগ্ধকর বনভূমির একটি নিখুঁত রূপ এই অঞ্চলে দেখাও যায়। সুন্দরবনের খ্যাতি বিখ্যাত রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার এবং বিভিন্ন প্রজাতির পাখি, চিতল হরিণ, কুমীর ও ভারতীয় পাইথন সহ অসংখ্য জীবজন্তুর আবাসভূমি হিসেবে। এই অরণ্যের সম্পদ ৩৩০ টি প্রজাতির গাছ - গাছালি, ৩৫ টি প্রজাতির সরীসৃপ , ৪০০ ধরনের মাছ, ২৭০ টি প্রজাতির পাখি ও ৪২টি প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী। বণ্যপ্রাণীদের অভয়ারণ্য, জীবমণ্ডলের জন্য সংরক্ষিত ভূমি এবং পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য নিয়ে এই উপকুলবর্তী ব-দ্বীপ অঞ্চলটি গঠিত। ১৯৮৭ সালে ইউনেস্কো এই অঞ্চলটিকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে ঘোষণা করে।

এখানে বসবাসকারী মানুষজন অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ জীবনযাপন করেন। বেঁচে থাকার জন্য তাঁদেরকে মূলত নদী ও জঙ্গলের উপর নির্ভর করতে হয়। দ্বীপগুলির মধ্যে যোগাযোগের রাস্তা একমাত্র নদীপথ। সমুদ্র, নদী, খাল ও খাঁড়ির মাঝে অবস্থিত সুন্দরবন দিনের মধ্যে দু'বার সমুদ্রের জলে প্লাবিত হয়। এই অঞ্চলের বাসিন্দাদের একটি বড়ো অংশ খাদ্য ও আয়ের জন্য জঙ্গলের উপর নির্ভরশীল তাঁরা মাছ ও কাঁকড়ার জন্য উপকুল বেয়ে এগিয়ে চলেন, কিংবা কাঠ ও মধুর সন্ধানে জঙ্গলের গভীরে ঢুকে যান। এই ভাবে জীবনের ঝুঁকি নেওয়ার ফলে তাঁরা যে কোনও সময়ে বাঘের শিকারে পরিণত হতে পারেন। এনপিআর-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, সুন্দরবনের যে অংশটি ভারতের মধ্যে পড়ে সেখানে প্রতি বছর গড়ে ২৫ জন মানুষ বাঘের হাতে আক্রান্ত হন। এখানকার বেশির ভাগ মানুষেরই বসবাস দারিদ্র সীমার অনেক নীচে। এর ফলে তাঁদের মধ্যে স্বাক্ষরতার হারও খুবই কম। এই উপকুলবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী বেশির ভাগ মানুষই নিরক্ষর। এই অঞ্চলের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা খুবই করুণ, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসাটুকু পাওয়ার জন্য এখানকার মানুষকে নৌকায় মাইলের পর মাইল পাড়ি দিতে হয়। সুন্দরবনের জীবন ঝুঁকিবহুল, বিচিত্র ও সম্পূর্ণ ভাবে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। আর এমন ভাবে সুন্দরবনের মানুষের সাথে সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের সম্পর্কের ভিত্তিপ্রস্তর গড়ে উঠেছে।

সুন্দরবন ও সুন্দরবনবাসীর মধ্যে সম্পর্কঃ

সুন্দরবনবাসীর সাথে সুন্দরবনের সম্পর্ক চিরন্তন। সুন্দরবন ছাড়া সুন্দরবনবাসীর জীবন ধারণ করা সম্পূর্ন অসম্ভব ব্যাপার। সুন্দরবনবাসীর জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষুদ্র থেকে অতিক্ষুদ্র জিনিসের জন্যও সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের উপরে নির্ভর করতে হয়। সুন্দরবনবাসীর প্রধান জীবিকা কৃষিকাজ, পশুপালন, মৎস্য শিকার, বনসম্পদ আহরণ, জনমজুর ইত্যাদি। পূর্বের সাথে

বর্তমান সুন্দরবনের জীবিকার মিল থাকলেও আরও নানা ধরনের বিকল্প জীবিকা সংগ্রহের পথ প্রসস্থ হয়েছে।

এক্ষেত্রে সুন্দরবনের নদীর অবদান অনস্বীকার্য। যেমন- মীনধরা, নদী, খাল, মোহনায় মাছ ধরা, নদী ও গভীর জঙ্গলের ভিতরে কাঁকড়া ধরা, ফিসারি বা মেছোঘেরিতে মাছ-কাঁকড়ার চাষ, মোম-মধু-কাঠ প্রভৃতি বনসম্পদ আহরণ, মাছ-কাঁকড়া আড়ত ও খুচরো ব্যবসা, জাল, আটোল, পোলো, বর্ষা, প্রভৃতি মৎস্য শিকারের সরঞ্জাম তৈরি, সুন্দরবনের বিভিন্ন হাট ও গঞ্জে ব্যবসা-বাণিজ্য, জল ও স্থল পথের পরিবহণের সাথে যুক্ত কাজ, মৃৎশিল্প ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের পেশা, যা সুন্দরবনবাসীর জীবনধারণের পথে একটু হলেও পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে। এই সমস্ত পেশার কথা উল্লেখ করা হলেও সুন্দরবনের ৯০ শতাংশ মানুষ এখনও কৃষিকাজের সাথে যুক্ত। তবে কৃষিকাজ সারা বছর ধরে না হওয়ায়, আর সকলের জমি না থাকার ফলে বছরের বাকি সময়গুলি তারা এই সমস্ত পেশা অবলম্বন করে[১] তাদের জীবিকা নির্বাহ করে।

সুন্দরবনের ইতিহাসে সুন্দরবনের নদীর অবদান সবথেকে গুরুত্বপূর্ন। নদী না থাকলে সুন্দরবনবাসীর জীবনে নেমে আসত দারুণ বিপর্যয়। সুন্দরবনের নদীকে কেন্দ্র করে হাজার হাজার মানুষ তাঁদের জীবিকার পথ খুঁজে পেয়েছে। যেমন নদী ও মানুষের সম্পর্ক বা সুন্দরবনবাসীর প্রাত্যহিকতায় নদীর অবদান কতটা তার একটি উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত জাল টেনে জীবন ধারণের মধ্যে নিহিত আছে। প্রায় সাড়ে তিন হাত লম্বা বাঁশের চারটি চেড়া, সেগুলি আয়তক্ষেত্রাকারে একে অন্যের সাথে বাঁধা থাকে। এই কাঠামোর সাথে এক প্রকার পাতলা জাল যুক্ত থাকে। জালটি চারকোণা এবং বেশ কিছুটা লম্বা থাকে। বাঁশের চেড়ার সাথে লম্বা দড়ি বাঁধা থাকে। আর ওই দড়ি ধরেই নদীর পাড় ধরে স্রোতের অনুকূল বা প্রতিকূলে একজন টানতে থাকেন। ফলে জালের মধ্যে নানা ধরনের

নদীর ছোট ছোট মাছের পোনা আটকে যায়। এই ভাবে বেশ কিছুটা জাল টেনে নিয়ে যাওয়ার পর জালের ভেতরের জঞ্জালপূর্ণ ছোট ছোট মাছের পোনা গুলোকে বাছার কাজ শুরু হয়। বাছাই করার সময় কেবলমাত্র এক ধরণের বিশেষ মাছের পোনাকে আলাদা পাত্রে তুলে রাখা হয়। এবং বাকি সমস্ত কিছু আবার নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। এরপর ওই বাছাই করা মাছের পোনা বাজারে বা গ্রামে আসা ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করে যে টাকা পাওয়া যায়, তা দিয়ে সংসার খরচ চালায়। এ ভাবেই চলে তাদের জীবন। এই দৃশ্য সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের প্রতিটি প্রান্তে, প্রতিটি অঞ্চলে দেখা যায়। আর যারা এই জাল টানেন তাদের বেশিরভাগ নারী। ওই বিশেষ ধরনের মাছের পোনাকে স্থানীয় ভাষায় 'বাগদা' বলা হয়, অর্থাৎ মীন ধরা[২]।

সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের পাঠানখালী অঞ্চলে এমনকি পাথরপ্রতিমা ব্লকের বিভিন্ন দ্বীপ অঞ্চলে অনেক নারী ও কিশোরী আছেন যারা রোজ সকাল, বিকাল, এমনকি গভীর রাতেও নদীতে জাল টেনে মীন ধরে। এবং এই ভাবে তাদের জীবিকা নির্বাহ করেন। এই গ্রামের একজন হলেন বিশাখা বেরা, বয়স ৫৫ বছর। তিনি বলেন এই গ্রামের নারী, পুরুষ, অধিকাংশ মানুষ সুন্দরবনের নদীতে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করেন। মীন ধরতে গিয়ে এখানকার অনেক মানুষ কুমিরের আক্রমণে মারা গেছেন, অনেকে জলে ডুবে মারা গেছেন। তারপরেও এখানকার মানুষের মীন ধরা থেমে নেই। কারণ মীন না ধরলে অনেক পরিবারের খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। আর তাছাড়া মীন ধরা ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প উপায়ও নেই যার দ্বারা তাদের জীবিকা নির্বাহ হয়। এখানকার অন্যান্য নারী-পুরুষদের মধ্যে কাকলী মাইতি (বনশ্যামনগর, পাথরপ্রতিমা), নূপুর হাজরা (জি-প্লট, পাথরপ্রতিমা), মহাদেব দোলুই (রাক্ষসখালী, পাথরপ্রতিমা), প্রতিমা গায়েন (এল-প্লট, পাথরপ্রতিমা), এছাড়া আরও অনেকে মাছ ধরে কোনো রকমে সংসার চালাচ্ছে, ছেলে-মেয়ের পড়ার খরচ মিটিয়ে জীবন অতিবাহিত

করছে। যে মীন ধরা হয় সেগুলো বিক্রি হয় ১০০০ মীনের দাম ২৫০ থেকে ৩০০ টাকা। অনেক সময় দাম কম বেশি হয়। আর সত্যি বলতে এখানে যদি নদীটা না থাকতো তাহলে হয়ত ভিনরাজ্যে কাজের জন্য যেতে হত[৩]।

কেবলমাত্র বয়স্ক নারী-পুরুষ নয়, এই সুন্দরবনে অনেক কিশোর, কিশোরী পড়াশোনার সাথে সাথে সময় পেলে নিজেদের খরচ চালানোর জন্য এই মীন ধরার কাজকে বেছে নিয়েছে। আমিও এই সুন্দরবনে বড় হয়েছি। আমার জন্মভূমি এই সুন্দরবন। একটা সময় ছিল যখন আমিও মায়ের সঙ্গে সংসারের খরচের জন্য নদীতে জাল টেনেছি। আসলে সুন্দরবন নামটি খুব সুন্দর, মায়াবী। কিন্তু এখানকার অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে শুরু করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহণ, সমস্ত কিছুর অবস্থা খুবই খারাপ। তাই সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও এখানকার নদী একটু হলেও আশার আলো দেখিয়েছে। সকলের মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছে। তাই সুন্দরবনের নদী এখানকার মানুষের বেঁচে থাকার প্রধান অবলম্বন।

সুন্দরবনবাসীর সাথে সুন্দরবনের গভীর সম্পর্কের একটি উজ্জলতম দিক হল মৎস্য শিকার। সুন্দরবনের ৫ লক্ষ মানুষ মৎস্য শিকারে সাথে যুক্ত। যারা মৎস্য শিকার করে তাদেরকে মৎস্যজীবী বা জেলে বলা হয়। মাছ জেলেদের জীবনধারণের ভিত। মাছ ধরা কেবল এদের জীবিকা নয়, এদের সংস্কার, সংস্কৃতি সমস্ত জীবনধারাই মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে। ভারতীয় সুন্দরবনে মোট দ্বীপের সংখ্যা ১০২টি। সেগুলোর মধ্যে ৫৪টি দ্বীপের জঙ্গল পরিষ্কার করে লোকবসতি গড়ে উঠেছে। এবং বাকি ৪৮টি দ্বীপ সুন্দরবনের সংরক্ষিত বনাঞ্চল হিসাবে স্বীকৃত। ভারতীয় মৎস্য সম্পদের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হল সুন্দরবন। সুন্দরবনের সমুদ্র মোহনা, নদী, খাল প্রভৃতি মাছের নির্ভরযোগ্য উৎসস্থল। সুন্দরবনে হিন্দু, মুসলিম, খ্রিষ্ঠান, বৌদ্ধ সকল সম্প্রদায়ের মানুষ মাছ ধরার সাথে যুক্ত[৩]। সুন্দরবনের

মৎস্যজীবীরা ছোট বড় নানা ধরণের নৌকার দ্বারা নদীতে মাছ ধরে। মৎস্যজীবীদের সাথে সুন্দরবনের পরিবেশের একটি গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। সুন্দরবনের মৎস্যজীবীরা বছরে চারমাস জলে নামে না। কারণ এই চারমাস ছোট ছোট মাছের পোনার জন্ম গ্রহণ করার সময়। অর্থাৎ মাছের প্রজন্মের প্রতিপালনের জন্য এই চারমাস তারা নদীতে মাছ ধরে না।

এমন ভাবে সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রে নদী-মানুষ, নদী ও পরিবেশের মধ্যে একটি অলিখিত সম্পর্ককে উপলব্ধি করা সম্ভব। সুন্দরবনবাসীর জীবিকা ও সুন্দরবনের সাথে সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হল সুন্দরবন ভ্রমণ ও পর্যটন। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের মোহনায় অবস্থিত নদীনালায় ঘেরা পৃথিবীর সবথেকে বৃহৎ ব-দ্বীপ এই সুন্দরবন। সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সুন্দরতা অন্য যে কোনো স্থানের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। নদী সুন্দরবনকে চারিদিক দিয়ে ঘিরে রেখেছে। সুন্দরবনে একমাত্র গড়ে উঠেছে জলকাদা পূর্ণ পৃথিবীর সবথেকে বৃহৎ ম্যানগ্রোভ অরণ্য। ফলে সুন্দরবনের এই প্রাকৃতিক সুন্দরতা দেখার জন্য দেশ এর সাথে সাথে বিদেশ থেকেও অনেক পর্যটনের আগমন ঘটছে, যা পর্যটন শিল্পের সাথে সাথে সুন্দরবনবাসীর জীবনেও দারুণ প্রভাব ফেলেছে। ফলে এই ভ্রমণের সাথে যুক্ত হয়ে সুন্দরবনের অনেক মানুষ তাদের জীবনধারণের একটি পথ খুঁজে পেয়েছে। এমন ভাবে সুন্দরবনবাসীর জীবনধারণের সাথে সাথে এগিয়ে চলার প্রেরণা হয়ে উঠেছে সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্র।

সুন্দরবনবাসীর দৈনন্দিন জীবন প্রণালীতে গভীর বাস্তুতন্ত্রের প্রভাবঃ

পরিবেশের ইতিহাস চর্চায় একটি নতুন সংযজন গভীর বাস্তুতন্ত্র। সুন্দরবনবাসীর জীবনের সমস্ত কিছুতে গভীর বাস্তুতন্তের প্রভাব বর্তমান। বাস্তুতন্তকে ছাড়া সুন্দরবনবাসী চলতে পারবে না। এই প্রসঙ্গে যদি আমি প্রথমে নদীর কথা বলি তাহলে বলব যে, সুন্দরবন একটি নদীকেন্দ্রিক সামুদ্রিক

ভূখণ্ড। নদী আর মানুষের জীবন এখানে এক সূত্রে আবদ্ধ। এ অঞ্চলে নদীকে কেন্দ্রকরেই মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক জীবন আবর্তিত। আবহমান কাল ধরে বাংলা সাহিত্যে শ্রমজীবী মানুষের প্রসঙ্গ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নদীকে কেন্দ্র করেই নিয়ন্ত্রিত হয় মানুষের জীবন, নদীর কোলেই গড়ে ওঠে মানব সভ্যতার ঐশ্বর্য। আবার নদীকেন্দ্রিক মানবসভ্যতা ও ঐশ্বর্য ধ্বংসও হয়েছে নদীর বুকেই। নদীর নিজস্ব একটি অদ্ভুত রহস্যময়ী রূপ আছে, যেখানে সে মানুষের বেঁচে থাকার প্রেরণা জাগায়। কিন্তু সুন্দরবনবাসীর লোভ, আজ সুন্দরবনের নদীকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছে। যার ফলে শুধু নদীর ধ্বংস সাধিত হচ্ছে সেটা বলব না, সাথে সাথে সুন্দরবনবাসীও ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

বর্তমানে সুন্দরবনের নদী সমস্যার মধ্যে অন্যতম সমস্যা হল নদীর গভীরতা কমে যাওয়া। নদীর গভীরতা কমে যাওয়ার একটি ক্ষতিকর প্রভাব সুন্দরবনের নদী বাঁধের উপরে পড়ছে। কারণ সুন্দরবনের বাঁধের উচ্চতার একটা সীমা আছে। কিন্তু নদীর গভীরতা কমে যাওয়ার ফলে নদীর জল ধারণ ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। আর নদীর বাড়তি জল নদীর বাঁধের উপর দিয়ে সমতলে চলে আসতে চাইছে। আর ফলে বাধ্য হয়ে নদী বাঁধের উচ্চতা বাড়াতে হচ্ছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে নদীর বাঁধ ফুটো করে জল ঢুকিয়ে মাছ চাষ। যার ফলে বাঁধের প্রচন্ড ক্ষতি হয়। সুন্দরবনের বিভিন্ন স্থানে নদীর বাঁধ ফুটো করে জল ঢুকিয়ে ফিসারি করে মাছ চাষ করা হয়। এই কাজে হয়ত সুন্দরবনের বেশ কিছু মানুষের জীবিকা নির্বাহ হয়। কিন্তু তার থেকে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হয় সুন্দরবনের নদী বাঁধ[৪]।

সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের নদী বাঁধকে সুন্দরবনের জীবন রেখা বলা হয়। তাই সুন্দরবনের ইতিহাসে সবথেকে গুরুত্বপূর্ন কাজ হল নদী বাঁধের যথাযথ সংরক্ষণ। কিন্তু বর্তমানে সেই সংরক্ষণের

ক্ষেত্রে নানা ধরণের আভাব দেখা দিচ্ছে, যার পরিনতি ভয়াভয় বন্যা। বন্যার ফলে সুন্দরবনের সাথে সাথে সুন্দরবনবাসীকে যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় সেগুলি হল-

১. প্রথম যে সমস্যার সৃষ্টি হয় তা হল নদীর নোনা জল সুন্দরবনের চাষযোগ্য জমিতে ঢুকে গিয়ে সুন্দরবনের শষ্যসম্পদকে বিনষ্ট করে ফেলে।

২. নদীর লবণাক্ত জলের প্রভাবে বা নোনা জলের সংস্পর্শে এসে মিষ্টি জলের দূষণ ঘটায়।

৩. পানীয় জলের উৎস নলকূপগুলি নষ্ট হয়ে যায়। ফলে বিপর্যয়ের সময় পানীয় জলের প্রয়োজন, সবার আগে প্রয়োজন।

৪. জনসাধারণের বাসস্থান, অর্থাৎ দরিদ্র, অসহায় সুন্দরবনবাসীর মাটির বাড়ি ভেঙে পড়ে যায়। ফলে যাদের ঘরবাড়ি ভেঙে যায় তাদের জীবন অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

৫. জলের স্রোতে রাস্তা, জেটি, ফুটব্রিজ, বাজার, সেচ ও নিকাশি ব্যবস্থার পরিকাঠামো সমস্ত কিছু ভেঙে পড়ে।

প্রাণীর জীবনও অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। কারণ নদীর নোনা জল প্রবেশ করে সবার আগে গৃহপালিত প্রাণীর খাদ্যকে বিনষ্ট করে দেয়। এছাড়া বন্যপ্রাণীর জীবনও এই বিপর্যয়ের সময় অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। ফলে বন্যার সময় মানুষ নিজের খাবার খুঁজে পায় না। আর গৃহপালিত প্রাণীর জন্য খাবার সংগ্রহ করে আনা সেটা একেবারে অসম্ভব ব্যাপার। ফলে বন্যার ফলে মানুষের সাথে সাথে অন্য প্রাণীকুলের উপরেও দারুণ প্রভাব পড়ে।

৭. বন্যা ও প্রাকৃতিক নানা ধরণের বিপর্যয়ের ফলে সৃষ্টি হওয়া সমস্যার মধ্যে মূল চিন্তা হল মানবজীবনের হানি সংক্রান্ত চিন্তা। অর্থাৎ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে মানব জীবন অনিশ্চিত হয়ে

পড়ে। নানা ভাবে মানব জীবনের উপরে আঘাত নেমে আসে। যেমন- বাসস্থানের অভাব, পানীয় জলের অভাব, স্বাস্থের অবনতি ইত্যাদি। অনেক সময় দেখা গেছে বন্যার পরে বন্যা কবলিত স্থানে নানা ধরণের রোগের কারনে মহামারী দেখা দিয়েছে। যার ফলে বহু মানুষের প্রাণ হারাতে হয়েছে। চর্মরোগসহ নানা রোগের প্রাদুর্ভাবে সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের মানব সম্পদ আজ জর্জরিত। সর্বাধিক আশঙ্কার বিষয় আয়লা পরবর্তী সময় সুন্দরবনবাসিকে ঘিরে এই অঞ্চলে এইডস রোগীর সংখ্যা ভয়ংকর ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। নিম্নে একটা পরিসংখ্যান[৫] তুলে ধরা হল-

এইডস-এর হানা

ব্লক	আয়লার আগে (২০০৯-এর ২৫ মে)	আয়লার পরে ২০১০ জুন থেকে ২০১৩ জুলাই
বাসন্তী	১০	২৯
পাথরপ্রতিমা	০৪	১৭
ক্যানিং-১	২৫	৫১
ক্যানিং-২	১৪	৩৪
কুলতলি	০৬	১৬
নামখানা	০৪	১৩
কাকদ্বীপ	০৮	২৪
মথুরাপুর-২	০৪	১৪
সজয়নগর-১	০৬	২৭

জয়নগর-২	১৪	৩২
সাগর	০৩	০৮
গোসাবা	০০	০৬

সুত্রঃ- সুন্দরবনঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা – ১, সম্পাদক নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল, পৃষ্ঠা- ২৩৭

৮. প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে সুন্দরবনের অর্থনৈতিক অবস্থা নিম্নমুখী হয়ে যায়। কারণ নোনা জলের প্রভাবে সুন্দরবনের শস্য ও জীবনহানি এই অঞ্চলের মানুষকে কর্মহীন ও ভূমিহীন করে তোলে। ফলে এই অঞ্চলের মানুষ একটা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলে।

৯. সর্বপরি সুন্দরবনের বন্যায় নদীর নোনা জলের প্রভাবে যে বিপর্যয় ঘটে সেই বিপর্যয় থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সুন্দরবনবাসী বনসম্পদের উপরে অতিরিক্ত চাপ ফেলতে থাকে। কারণ আক্রান্ত মানুষ নিজেদের জীবনধারণের জন্য বনসম্পদ ও জলসম্পদকে বেশি করে ব্যবহার হরতে থাকে। ফলে সুন্দবনের যে প্রাকৃতিক ভারসাম্য তার উপরে প্রভাব পড়তে থাকে। এবং ধীরে ধীরে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হতে শুরু করে[৫]।

সুন্দরবনের যে সমস্ত সমস্যার কারণে বর্তমানে সুন্দরবন বিপর্যয়ের মুখে তার মধ্যে একটি অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ন সমস্যা হল সুন্দরবনের জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে সৃষ্টি হওয়া সমস্যা। বর্তমানে সুন্দরবনের অরণ্যের পরিধি ক্রমাগত হ্রাস পেলেও জনসংখ্যা ভয়ঙ্কর ভাবে দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত দু-শতাব্দীর মধ্যে ৫০০০ বর্গ কিলোমিটার বন ধ্বংস করে জনবসতি গড়ে উঠেছে। এখন সুন্দরবনের অরণ্যের পরিমাণ মাত্র ৮২৬৭ বর্গ কিলোমিটার।

১৯৫১ সালে সুন্দরবনের জনসংখ্যা ছিল ১২ লক্ষের কম। ১৯৭১ সালে জনসংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ২৪ লক্ষ। ১৯৯১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হল ৩২ লক্ষ। এখন সুন্দরবনের জনসংখ্যা প্রায় ৪৩ লক্ষের মতো। অর্থাৎ ৫০ বছরে সুন্দরবনের লোকসংখ্যা ৩০ লক্ষের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে[৬]। গত ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ২০০১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সুন্দরবনের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার-

লোকগণনার স্থান	লোকগণনার সময়	জনসংখ্যা	বৃদ্ধির হার (শতাংশ)
অবিভক্ত সুন্দরবনের জনসংখ্যা।	আদমসুমারি ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে	২,৯৬,০৪৫ জন।	৬৫%
অবিভক্ত সুন্দরবনের জনসংখ্যা।	আদমসুমারি ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দ।	৪,৮৭,৩৭৭ জন।	৫৫%
অবিভক্ত সুন্দরবনের জনসংখ্যা।	আদমসুমারি ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দ।	৭,৫৪,৪২১ জন।	৫৪%
শুধুমাত্র ভারতীয় সুন্দরবনের জনসংখ্যা	আদমসুমারি ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দ।	১১,৫৯,৫৫৯ জন।	৫৪%
শুধুমাত্র ভারতীয় সুন্দরবনের জনসংখ্যা	আদমসুমারি ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দ।	১৪,৪৬,২৪২ জন।	৮০%
শুধুমাত্র ভারতীয় সুন্দরবনের জনসংখ্যা	আদমসুমারি ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দ।	১৮,০০,০০০ জন।	৮০%

শুধুমাত্র ভারতীয় সুন্দরবনের জনসংখ্যা	আদমসুমারি ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দ।	২৭,০০,০০০ জন।	৬৭%
শুধুমাত্র ভারতীয় সুন্দরবনের জনসংখ্যা	আদমসুমারি ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দ।	৩২,০৫,৫২৪ জন।	৮৪%
শুধুমাত্র ভারতীয় সুন্দরবনের জনসংখ্যা	আদমসুমারি ২০০১ খ্রিষ্টাব্দ।	৪২,০০,০০০ জন।	৭৬%

এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার[৭] সুন্দরবনের পরিবেশে তথা সমস্ত ব্যবস্থাকে প্রচণ্ড ভাবে আঘাত করছে।

সুন্দরবন পৃথিবীর একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন। নানাবিধ কারণে সুন্দরবন ও বনের উপর নির্ভরশীল পেশাজীবীদের জীবিকা নির্বাহ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এ বনের প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। মূল্যবান প্রাণিজ, জলজ ও বনজ সম্পদ মিলিয়ে এ বন অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদের আধার। সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্র উপকূলীয় এলাকার লাখ লাখ মানুষের জীবন জীবিকার উৎস হিসাবে একমাত্র অবলম্বন। কাঠ, মাছ ও অন্যান্য বনজ সম্পদ আহরণের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষ বছরে প্রায় ৬ মাস জীবিকার জন্য সরাসরি সুন্দরবনের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে এর সংখ্যাও বাড়ছে। জলবায়ু পরিবর্তন, সুন্দরবন সম্পদ অসচেতন ভাবে মাত্রাতিরিক্ত আহরণ, যথেচ্ছা ব্যবহার এবং নির্বিচারে বন নিধনের কারণে এই বিশাল প্রাকৃতিক সম্পদের অস্তিত্ব সঙ্কটের সম্মুখীন। পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের ধারণা, বনের এ অবক্ষয় চলতে থাকলে সুন্দরবনের অস্তিত্ব এক সময় বিলীন হয়ে যাবে। এর ফলে নতুন যে পরিবেশ সৃষ্টি হবে তা হবে ভয়াভয় ও বিপদজনক। আর এর জন্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে সুন্দরবনের উপর নির্ভরশীল

কয়েক লাখ পেশাজীবী মানুষ ও তাদের পরিবার। আর এ ক্ষতির প্রভাব পড়বে স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সুন্দরবনের উপর নির্ভরশীল পেশাজীবী সম্প্রদায়ের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বনের সম্পদ কমে যাচ্ছে। বনজীবীদের পাস পারমিট পাওয়ার ক্ষেত্রে জটিলতা, আহরিত সম্পদের বাজারজাত করণের সমস্যা, বনদস্যুদের অত্যাচার, বনজ সম্পদের উপর আইনানুগ অধিকার না থাকা, মধ্যস্বত্বভোগী ও মহাজনদের শোষণ, আইনী হয়রানিসহ বিভিন্ন কারণে সুন্দরবনের পেশাজীবীদের জীবিকা আজ সমস্যার সম্মুখীন। বিশেষ করে দরিদ্র বাওয়ালী, মাওয়ালী ও মৎস্যজীবীর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ধনী ব্যবসায়ী ও মহাজনদের নৌকায় দিন মজুরের ভিত্তিতে সুন্দরবনের সম্পদ আহরণ করতে বাধ্য হচ্ছে। আর এই সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার জন্য সুন্দরবনের জনসংখ্যা বৃদ্ধি একটি প্রধান ভূমিকা পালন করছে।

এমনভাবে সুন্দরবনের উপর তথা সুন্দরবনবাসী গভীর বাস্তুতন্ত্রের উপর ভঙ্গকর প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে। একদিকে নদীর সমস্যা, অন্যদিকে বনসম্পদের পরিমাণ ক্রমাগত কমে যাচ্ছে। আবার সুন্দরবনের জনসংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। এমন ভাবে চলতে থাকলে একদিন সমস্ত সুন্দরবনের স্বাভাবিক বাস্তুতন্ত্রের বা গভীর বাস্তুতন্ত্রের শৃঙ্খলা ধ্বংস হয়ে গিয়ে সেই স্থান দখল করবে বঙ্গোপসাগরের সামুদ্রিক জলরাশি। পুর্বে উল্লেখ করেছি গভীর বাস্তুতন্ত্র হল পরিবেশ ইতিহাসের নতুন সংজযন। তাই বাহ্যিক অর্থে যে সম্পদ আমাদের জীবন ধারনে সহায়তা দান করে আসলে, অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সেটাই অবলুপ্তির জায়গায় আমাদেরকে নিয়ে আসে। এছাড়া গভীর বাস্তুতন্ত্রের ব্যবহার তখন হয় যখন গভীর সঙ্কটের সৃষ্টি হয়।

সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের প্রতি সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি ও সুন্দরবনবাসীঃ

সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রকে নিয়ে উন্নয়নের কাজ অনেক দিন ধরেই চলছে। এবং এই উন্নয়নের ধারাতে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার দু'য়েরই সম্মিলিত প্রচেষ্টা সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রে সক্রিয় ভাবেই কার্যকরী হচ্ছে। সুরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রকে ঘিরে উন্নয়ন বলতে ৫৩৬৩ বর্গ কিলোমিটার জনবসতি, নদী ও নদী সংলগ্ন চর ১৯২০ বর্গ কিলোমিটার এবং ২৩৪৪ বর্গ কিলোমিটার বনাঞ্চলের উন্নয়ন[৯]।

কিন্তু সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রকে ঘিরে মূলতঃ যে উন্নয়ন বা ভালো দিকের একটা পরিবর্তন সাধন, তা কেবলমাত্র সুন্দরবনের মানব সমাজের জন্য। যদি মানুষের উন্নয়ন না ঘটে তবে কোনো উন্নয়ন স্থায়ী লাভ করতে পারেনা। অর্থাৎ সুন্দরবনবাসীর উন্নয়ন মানেই সমগ্র সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের উন্নয়ন। যে কারণে সুন্দরবনবাসীর উন্নয়ন হতে গেলে তাঁদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সংস্কৃতির উন্নয়ন হওয়া প্রয়োজন বলে আমার মনে হয়।

সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্র ও বাস্তুতন্ত্র কেন্দ্রিক সুন্দরবনবাসীর সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারিভাবে বিভিন্ন পরিকল্পনা ও পরিষেবা যে গুলি মানুষের সুস্থ জীবনযাত্রার জন্য মুলত দরকার, বর্তমানে সেই সমস্ত প্রকল্পের কাজ চলচ্ছে। প্রকল্প গুলির মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য বলে বিবেচিত হয়- প্রধানমন্ত্রী গ্রাম-সড়ক যোজনা, এন অ্যার ই জি এ ইন্দিরা আবাস যোজনা, গীতাঞ্জলী প্রকল্প, নিজ গৃহ নিজ ভূমি প্রকল্প, অধিকার প্রকল্প, ব্যাঙ্ক সহায়তা, বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা, পরিবার সহায়তা কৃষাণ ক্রেডিট, রেশন ব্যবস্থা, মি-ডে মিল ব্যবস্থা, খাদ্য সুরক্ষা প্রকল্প, স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রকল্প, অসংগঠিত শ্রমিকদের ভবিষ্যনিধি প্রকল্প, কন্যাশ্রী, শিক্ষাশ্রী, যুবশ্রী, পথশিল্পী ভাতা, সবুজ সাথি, সাইকেল ও পোশাক বিতরণ প্রকল্প[১০] ইত্যাদি।

বর্তমানে সুন্দরবনবাসী ও গভীর বাস্তুতন্ত্র কেন্দ্রিক সুন্দরবনের সার্বিক এক উন্নয়ন ও উন্নতির লক্ষ্যে ত্রিমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। যথা- ক) কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা, খ) রাজ্য সরকারের প্রকল্প, গ) বিশ্বব্যাঙ্কের সহায়তা পুষ্ট প্রকল্প। তাছাড়া গ্রামীণ কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সরকার বছরে ১০০ দিন কাজের যে নিশ্চয়তা সংক্রান্ত প্রকল্প এনেছে, তা সুন্দরবনবাসীর কাছে জীবন-জীবিকার অগ্রগতির ক্ষেত্রে একটা অভিনভ পদক্ষেপ বলা যেতে পারে। সম্প্রতি আমাদের রাজ্য সরকার ও 'সহজ-ই-ভিলেজ' যৌথ ভাবে 'চাকরি-ডত-ইন' পোর্টাল চালু করায় গ্রামীণ কর্মসংস্থানেরও একটা জায়গা তৈরি হয়েছে[১১]। সুন্দরবনের গভির বাস্তুতন্ত্রকে ঘিরে প্রাকৃতিক সমস্যার পাশাপাশি মানব সমাজের আর্থ-সামাজিক সমাস্যাও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই প্রতিটি সমস্যার সমাধানই হবে সুন্দরবনবাসীর সার্বিক উন্নয়নের সফল পদক্ষেপ।

সরকারি পদক্ষেপ ব্যতীত বেশ কিছু বে-সরকারি সংস্থা অর্থাৎ এনজিওদের (নন-গর্ভনমেন্টাল অর্গানাইজেশন) সাহায্যকারী হাত সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের সম্পদের উপযোগিতায় ও রক্ষায় সক্রিয় এক ভুমিকা গ্রহণ করেছে। যদিও এই এনজিও এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গুলির উদ্দেশ্য অর্থ উপার্জন। তবুও এদের সঙ্গে সুন্দরবনবাসির মধ্যে এক গভীর সম্পর্ক রয়েছে। সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রে বনজীবি ও বনশ্রমিক হিসাবে যারা কাজে নিযুক্ত তাঁদের সুখ-দুখ, হাসি-কান্না, আপদে-বিপদে এই এনজিওরাই পরামর্শক ও পরিদর্শকের ভূমিকা পালন করে। সুন্দরবনে কর্মরত বিশিষ্ট কিছু সংস্থা গুলি হল-

১। Tagore Society For Rural Development, 46B, Arabindo sarani, Kolkata700005, ph: 25552433, 25430678

২। Nature Environment and Wildlife Society(NEWS), 10 chowringhee Terrace, kolkata- 700020, ph: 22234148

৩। Southern Health Improvement Society(SHIS), P.O. Bhangar, south 24 parganas, -743502, ph:- 03218-271034

৪। WWF-Eastern Region, First Floor, Tata centre, 43, J.L. Nehru Road, Kolkata-700071, ph: 22883038

৫। Canning Yuktibadi Sangha, Canning, South 24 parganas, ph: 03218-256076

৬। Prakriti Samsad, 65 Golf Club Road, Kolkata 700033, ph: 24127612

৭। Gosaba Rupayan, Ram Krishna Mission Lok Shiksha Parishad, P.O + Vill-Aranpur, south 24 Parganas,

উল্লিখিত সংস্থা গুলি[১২] সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রকে ঘিরে জনগণের সেবায় কোনো-না-কোনো ভাবেই যুক্ত রয়েছে। ৩৫০০ কিলোমিটার নদী বাঁধ দিয়ে সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্র সুরক্ষিত, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সামুদ্রিক ঢেউ ক্রমশ আঘাত সৃষ্টি করে এই নদী বাঁধের উপর যেকারণে প্রতিনিয়তই সমুদ্র গ্রাস করছে সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রকে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ আয়লা (২৫-০৫-২০০৯) প্রায় ৮৯৫ কিলোমিটার নদী বাঁধকে ধ্বংস করেছে। প্রতিনিয়ত ক্ষয় প্রাপ্ত হচ্ছে বাস্তুতন্ত্র। তাই সুন্দরবনের উন্নয়ন মানেই কিন্তু উন্নত প্রযুক্তিতে এই নদী বাঁধের সংস্কার সাধন করা। সেই অর্থে এই কাজ এখনও চলছে। বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের নদী বেষ্টিত এই দ্বীপ গুলির সমস্যা চিরকালীন, সেই কারণে প্রতিনিয়ত সমাধান ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়। নিম্ন লিখিত

কিছু ক্ষেত্র সমীক্ষা আমার এই গবেষণা কে অনেক সহায়তা দান করেছে। তাঁদের বক্তব্য তুলে ধরার চেষ্টা করলাম।

গ্রাম- উত্তর সুরেন্দ্র গঞ্জ, পোঃ- দাসপুর, পাথরপ্রতিমা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

সাক্ষাৎকারের তারিখ- ২২-০৩-২০১৯, সময়- সকাল ১০টা ২০মিনিট

নূপুর হাজরাঃ বয়স ৫০ বছর, স্বামী- মৃত বাটুল হাজরা। দুই ছেলের মধ্যে ছোট ছেলে মারা গেছে। বড় ছেলে মাকে দেখে না। ভূমিহীন মানুষ এরা। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই নদীর মাছ ও মীন ধরে জীবন চালাতো। ২৫-০৫-২০০৯ এর আয়লাতে স্বামী বাটুল হাজরা নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। নূপুর হাজরা মীন ধরে ও অন্যের জমিতে দীনমজুরি করে জীবন চালায়। আয়লাতে মাটির বাড়ি পুরোটাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। যে কারণে সরকারের পক্ষ থেকে অর্থাৎ জি-প্লট গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে এক কামরার একটা পাকা বাড়ি পেয়েছেন। তাছাড়া ১০০ দিনের কাজের জন্য জব-কার্ড পেয়েছেন। তিনি মীন ধরার জন্য নাইলনের একটা জাল কিনেছেন, এতে তাঁর মনে হয়েছে সারাটা জীবন ভাল ভাবে কেটে যাবে।

গ্রাম- গোবরধনপুর, পোঃ- ইন্দ্রপুর, থানা- গোবরধনপুর কোস্টাল, পাথর প্রতিমা, দঃ ২৪ পরগণা

সাক্ষাৎকারের তারিখ- ২২-০৩-২০১৯, সময়- বিকেল ৩টে ৫৪মিনিট

তপন মাইতিঃ বয়স- ৩৭ বছর, পেশা- মৎসজীবি, স্ত্রী- মনি মাইতি ও এক কন্যা সন্তান নিয়ে তিনজনের পরিবার। চাষযোগ্য জমি বলে কিছুই নেই। বঙ্গোপসাগর গ্রাস করেছে। শুধু একটি মাত্র বসত বাড়ি। নদীর মাছ ধরে আর জঙ্গলের কাঠ বিক্রি করে জীবন চালাতো। বর্তমানে পঞ্চায়েত

থেকে তপন মাইতির স্ত্রী মনি মাইতিকে ১০০ দিনের কাজের সুপারভাইজার নিযুক্ত করায় হাসি ফুটেছে ওদের সংসারে।

গ্রামঃ- উত্তর সুরেন্দ্র গঞ্জ, পোঃ- দাসপুর, থানা- গোবর্ধনপুর কোস্টাল, পাথরপ্রতিমা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

সাক্ষাৎকারের তারিখ- ২৩-০৩-২০১৯, সময়- রাত্রি ৭টি ৩০মিনিট

আশিষ কুমার বর্মণঃ বয়স- ৬৮ বছর, জী-প্লট গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধানের দায়িত্ব সামলান। নিজেই একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। সরকারি উন্নয়নের ব্যাপারে ওনার বক্তব্য, জী-প্লটের ভৌগলিক বিস্তার দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৫ কিলোমিটার এবং প্রস্থে গড়ে ১.৫ কিলোমিটার। জী-প্লটের উত্তরে চালতাদুনিয়া নদী, পুবে ও পশ্চিমে জগদ্দল ও কার্জন ক্রীক নদী এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। গ্রাম সড়ক যোজনায় জী-প্লট এখন উন্নয়নের ধারায় ভাসছে। পুরো দ্বীপটাই এখন পাকা রাস্তায় মোড়া রয়েছে। ইতিমধ্যে দ্বীপটির সর্বত্র বৈদ্যুতিক আলো পৌঁছে গেছে। গরীব মানুষদের জন্য মাটির বাড়ির পরিবর্তে পাকা বাড়ির প্রচেষ্টা চলছে। শিক্ষা ব্যাবস্থা আগের থেকে অনেক উন্নত। স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নত করার ব্যাপারে একটা পরিকল্পনা চলছে। কেননা, দুরত্ব এবং যোগাযোগ ব্যাবস্থার অবনতির কারণে ডাক্তারি ব্যাবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। মাঝেমধ্যে বেসরকারি সংস্থা শিস (সাউদার্ন হেলথ্ ইম্প্রুভমেন্ট সোসাইটি) -এর সহযোগিতার হাত পড়ে এখানকার স্বাস্থ্য তথা সমাজ ব্যাবস্থায়।

গ্রামঃ গোবিন্দপুর, রাক্ষসখালি, পাথর প্রতিমা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

সাক্ষাৎকারের তারিখ- ২৪-০৩-২০১৯, সময়- সকাল ৯টা ৫২মিনিট, শুকদেব দোলুইঃ বয়স ৭০ বছর, শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ পাননি। ১৪ বছর বয়স থেকেই নদীর সঙ্গে সম্পর্ক। জীবন শুরু

মৎস্যজীবি হিসেবে। ১৯৮৩ সালের প্রাকৃতিক দুর্যোগে নৌকাডুবি হন। ভগবান তাঁকে বাঁচিয়ে দেন। তখন থেকেই মাছ ধরা ছেড়ে কৃষিকাজ ও বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করেন। এটাই তাঁর পেশা ছিল একসময়। মৎসজীবি হিসেবে জীবন শুরু করে তাঁর ছোট ছেলে (লাল্টু)। বঙ্গোপসাগর তাঁর জীবন কেড়ে নেয়। নামখানায় একটা ইলিশ ধরার বড় নৌকাতে কাজ করতো ছেলেটি। ২০০৯ এর আয়লা নদীবাঁধ ভেঙ্গে বাড়ি ঘর ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সর্বস্বান্ত এক হত দরিদ্র মানুষ ইনি। পাথর প্রতিমা পঞ্চায়েত সমিতি থেকে ও ব্রজবল্লভপুর গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে কিছু টাকা সরকারি অনুদান পান। তাই দিয়ে দুই কামরার পাকা বাড়ি করে স্ত্রী-পুত্র-বৌমা-নাতনি সহ বিচ্ছিন্ন এক পরিবারে বসবাস করেন। শুকদেব দোলুই মহাশয় শেষ দিনটার জন্য প্রহর গুনছেন।

গ্রামঃ ছয় মাইল, নামখানা, পোঃ বকখালি, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

সাক্ষাৎকারের তারিখ- ১৮-০৪-২০১৯, সময়- ১১টা ৪৫মিনিট

গীতা দোলুইঃ- বয়স ৫৩ বছর। স্বামী পুণ্য দোলুই, ও দুই পুত্র বৌমা নিয়ে ৮ জনের সংসার। স্বামীর বর্তমান বয়স ৭১ বছর, কর্মে অক্ষম। সংসার চালাতে ভরসা দুই ছেলে। গীতা দোলুই নদীতে মীন ধরে সংসার চালাতো। প্রথম জীবনে স্বামী তাকে সমকাজে সঙ্গ দিত। আয়লাতে অল্প পরিমান ক্ষতিগ্রস্ত হন। তাতেও সরকার থেকে ক্ষতিপূরণ বাবদ ১০,০০০ টাকা অনুদান পান। দুই ছেলে চাষের কাজ করেন। অর্থ জমিয়ে একটা ছোট নৌকা বানিয়েছে। নদীর মাছ সংগ্রহ করা এখন তাদের পেশা হয়ে উঠেছে। মাঝেমধ্যে জঙ্গলের কাঠ তাঁদের অর্থের ভাণ্ডার পূর্ণ করে।

গ্রামঃ ভগবতপুর, পোঃ পাথরপ্রতিমা, থানা- পাথরপ্রতিমা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

সাক্ষাৎকারের তারিখ- ২৭-০৪-২০১৯, সময়- সকাল ৯টা ১০মিনিট

নারায়ন ভুঁইঞাঃ বয়স- ৬১ বছর, পেশায় শ্রমিক। ইনি একেবারেই নিরক্ষর মানুষ। ১২ বছর বয়স থেকে বাবার সাথে জঙ্গলে কাঠ কাটতে ও মধু সংগ্রহে যেতেন। স্বামী-স্ত্রী আর ছেলে মেয়ে মিলে ৭ জনের সংসার। ৩ মেয়ে ও এক ছেলের বিয়ে হয়েছে। একেবারেই হত দরিদ্র মানুষ। সম্প্রতি স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে, তাই মানসিক ভাবেই তিনি অক্ষম হয়ে পড়েছেন। ছেলে দুজন রাজমিস্ত্রির কাজ করে। এভাবেই দারিদ্রতা দূর হয়। চাষের জমি বলতে কিছুই নেই। প্রতি বছর ৫০০-১০০০ টাকা অগ্রিম দাদন নিয়ে ৫ কাঠা ১০ কাঠা যা জায়গা জমি পান তা দিয়ে সারা বছরের খাদ্যের জোগাড় তৈরির ব্যবস্থা করেন। আয়লাতে পুরো বাড়িটাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সরকার থেকে সামান্যকিছু আর্থিক অনুদান পেয়েছেন। পাকা বাড়ি তৈরি করে উঠতে পারেনি এখনও। পাথরপ্রতিমা পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে পাকাবাড়ি তৈরির আশ্বাস পেয়েছেন। বাড়ির সদস্যরা অসুস্থ হলে স্থানীয় পাথরপ্রতিমা হাসপাতালে সরকারি সুবিধা পান। মাঝেমধ্যে অঙ্গনওয়াড়ি স্বাস্থ্যকর্মীরা বাড়িতে এসে ভালোমন্দের খবর নিয়ে যান।

সাক্ষাৎকার গুলি পর্যালোচনা করলেই বোঝা যায় যে, বিভিন্ন সময়ে ঘটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও আয়লা সুন্দরবনবাসির স্বভাবিক জীবনে ছন্দপতন ঘটিয়েছে। কেড়ে নিয়েছে ঘর-বাড়ি, পরিণত করেছে নিঃস্ব ও সহায় সম্বলহীন করে। সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অস্থিরতা থাকা সত্বেও কোঠর জীবন সংগ্রামে, সরকারি-বেসরকারি সহযোগিতা এখানকার মানুষদের পথ চলার বন্ধু হয়ে ওঠে। উন্নয়ন স্তব্ধ হয়ে পড়ে নতুন নতুন কর্মসংস্থান ও কর্মসংস্কৃতির অভাবে। সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রকে বাঁচাতে সরকারি পক্ষ থেকে গাছ লাগানোর প্রকল্প শুরু হয়েছে, উদ্দেশ্য কেবলমাত্র

প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিহত করা। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি ভাবনা, সাহায্য সহযোগিতা ছাড়াও সুন্দরবনের আর্থসামাজিক উন্নয়নে নিমপীঠ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম এবং রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ ইত্যাদির ভূমিকাকে সাধুবাদ জানাতে হয়। অবহেলিত ও অনুন্নত মানুষের সেবার জন্য ১৯৬০-১৯৬১ সাল থেকে নিমপীঠ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম কাজ শুরু করে। নিমপীঠ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় চিকিৎসা পরিকাঠামো ঠিক না থাকায় আশ্রমের জমিতেই রাজ্য সকারের সহযোগিতায় প্রথমে ১০ ও পরে ৩০ শয্যা বিশিষ্ট গ্রামীণ হাসপাতাল স্থাপিত হয়, কেবলমাত্র সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রে বসবাসকারী দরিদ্র মানুষদের সুচিকিৎসার জন্য[১৩]। ১৯৭৯ সালে এখানেই গড়ে ওঠে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, যেখানে ইন্দো-ইজরায়েল যৌথ প্রচেষ্টায় উন্নত পদ্ধতির মাধ্যমে লুপ্ত দেশী মাছ চাষ করে কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছে বহু বেকার যুবক। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়ে এই আশ্রম সুন্দরবনের কৈখালিতে সম্পন্ন করেছে জেটি ঘাট, পাকা রাস্তা, অতিথি নিবাস, সৌরশক্তির সাহায্যে আলো ও জলতোলা ইত্যাদি তৈরির কাজ।

রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের অন্যতম শাখা কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত নরেন্দ্রপুরের অধীন রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বলেই গণ্য হয়ে থাকে। নানা কাজে লোকশিক্ষা পরিষদের সুনাম রয়েছে। সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের বহু গ্রামে নিরক্ষরতা বেশ বড় একটা সমস্যা, যে কারণে পরিষদ স্বাক্ষরতা কর্মসূচী গ্রহণ করে। এপর্যন্ত মোট আটটি ব্লকের ১০৬৮টি সাক্ষরতা কেন্দ্রের মাধ্যমে পুরুষ ১৩০২০ ও মহিলা ১২০০০ মিলিয়ে মোট ২৫০২০ জনকে সাক্ষর করা সম্ভব হয়েছে[১৪]। এছাড়াও নানান উন্নয়ন মুখি কাজের পাশাপাশি বৃত্তিমুলক প্রশিক্ষণ সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের অধিবাসীদের স্বনির্ভরতার পদ দেখাছে। সংস্কার মূলক কাজের পাশাপাশি নিবিড় স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচী অনুযায়ী এপর্যন্ত সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের অন্তর্গত সাগর,

জয়নগর-১, পাথরপ্রতিমা ও সন্দেশখালি-২ এই চারটি ব্লক মিলিয়ে মোট ৭০,০০০ এর কিছু বেশি শৌচালয় বানিয়ে উন্নত জীবন যাপনে অভ্যস্ত করানো হয়েছে।

তথ্যসূত্রঃ

১. দেবপ্রসাদ জানা, *শ্রীখণ্ড সুন্দরবন*, কলকাতা, দীপ প্রকাশন, ২০০৪, পৃ. ৩২-৩৭।

২. ক্ষেত্র সমীক্ষা: বিশাখা বেরা, গোসাবা, পাঠানখালী, বয়স-৬০, পেশা- নদীতে মীন ধরা।

৩. এ. এফ. এম. আবদুল জলীল, *সুন্দরবনের ইতিহাস*, বাংলাদেশ, লিঙ্কম্যান পাবলিকেশন, ১৯৬৭, পৃ. ২৭৯।

৪. দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সংখ্যা-১৪০৬, কলকাতা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০০, পৃ. ১৯৩।

৫. নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল, সুন্দরবনঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা – ১, সমকালের জিয়নকাঠি প্রকাশন, জুলাই-ডিসেম্বের ২০১৫, যুগ্ম সংখ্যা, পৃ. ২৩৭

৬. সমকালের জীয়নকাঠি, পৃ. ২০৬-২০৭।

৭. শঙ্কর কুমার প্রমানিক, *সুন্দরবন-জল-জঙ্গল-জীবন*, কলকাতা, পুস্তক বিপনি, প্রথম সংস্করন, ১৪ এপ্রিল ২০০৮, পৃ. ৫৫।

৮. সন্তোষ বর্মন, *সুন্দরবনের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা*, ২০১০।

৯। কানাইলাল সরকার, সুন্দরবনের ইতিহাস, পান্ডুলিপি প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা ২০১৭, পৃ-৪৫২

১০। কানাইলাল সরকার, সুন্দরবনের ইতিহাস, পান্ডুলিপি প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা ২০১৭, পৃ ৪৫৩

১১। সুকুমার সিং, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ইতিহাস(একখণ্ডে), মাস এন্টারটেনমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করন, ২৫ অক্টোবর, ১৯৯৫, দ্বিতীয় সংস্করন, একখণ্ডে-কলকাতা পুস্তকমেলা-২০১০, পৃ ৯৭৫

১২। বিশ্বজিৎ রায়চৌধুরী, সুন্দরবন, নান্দনিক প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০১৪, পৃ ৭৬

১৩। দেবপ্রসাদ জানা, শ্রীখণ্ড সুদরবন, দীপ প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০০৪, পৃ ৩৪১

১৪। দেবপ্রসাদ জানা, শ্রীখণ্ড সুন্দরবন, দীপ প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, ২০০৪, পৃ ৩৪৯

১৫। ক্ষেত্র সমীক্ষা,

১- নূপুর হাজরা, উত্তর সুরেন্দ্র গঞ্জ, দাসপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগানা, বয়স- ৫০, পেশা- শ্রমিক

২- তপন মাইতি, গোবরধনপুর, ইন্দ্রপুর, পাথরপ্রতিমা, দক্ষিণ ২৪ পরগানা, বয়স- ৩৭, পেশা- মৎস্যজীবী

৩- আশিষ কুমার বর্মণ, উত্তর সুরেন্দ্র গঞ্জ, দাসপুর, পাথরপ্রতিমা, দক্ষিণ ২৪ পরগানা, বয়স- ৬৮, পেশা- শিক্ষকতা

৪- শুকদেব দোলুই, গোবিন্দপুর, রাক্ষসখালি, পাথরপ্রতিমা, দক্ষিণ ২৪ পরগানা, বয়স-৭০, পেশা- শ্রমিক

৫- গীতা দোলুই, ছয় মাইল, বকখালি, নামখানা, দক্ষিণ ২৪ পরগানা, বয়স- ৫৩, পেশা- মীন চাষ

৬- নারায়ণ ভূঞয়া, ভগতপুর, পাথরপ্রতিমা, দক্ষিণ ২৪ পরগানা, বয়স- ৬১, পেশা- শ্রমিক

তৃতীয় অধ্যায়

সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্র ও তার ভবিষ্যৎ

প্রকৃতি তার শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বা বলা যায় নিজেকে রক্ষা করতে নিজের শাসনে নিজেই নিমজ্জিত হয়। যেখানে অন্যের শাসন কাজ করে না। অরণ্যের লীলাভূমি তথা ম্যানগ্রোভ টাইগার ল্যান্ড হিসাবে আমাদের আলোচিত সুন্দরবনের ক্ষেত্রেও একই আইন প্রযোজ্য বলে মনে হয়। কারন সুন্দরবন আপন খেয়ালে যে বাস্তুতন্ত্র রচনা করেছে তাতে বাইরের বল প্রয়োগে বোধহয় এর উৎপাটন সম্ভব নয়।

সুন্দরবনে যে গভীর বাস্তুতন্ত্র রচিত হয়েছে বা বলা যায় সুন্দরবন যে বাস্তুতন্ত্র নিজে রচনা করেছে সেই গভীর বাস্তুতন্ত্রকে ঘিরে রয়েছে অনুপম সৌন্দর্য, ভয়াল-ভয়ংকর নিস্তব্ধতা, আর রয়েছে উদ্ভিদ সম্পদ, প্রাণী সম্পদ ও সর্বোপরি মনুষ্য সম্পদ। ২০১১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৪৪,২৬,২৫৪ জন জনসংখ্যা বিশিষ্ট মানব সম্পদের বাস এই গভীর বাস্তুতন্ত্রে। সুন্দরবনের ১০২ টি দ্বীপের মধ্যে ৫৪ টি দ্বীপেই কেবলমাত্র জনবসতি গড়ে উঠেছে[১]। সারা পৃথিবীর মোট ৫০ টি লবনাম্বু উদ্ভিদ প্রজাতির মধ্যে সুন্দরবনেই পাওয়া যায় ৩৫ টি উদ্ভিদ প্রজাতি। বনবিভাগের হিসাবে বনাঞ্চলে মোট মেরুদণ্ডী প্রাণীর সংখ্যা ৪৮১ টি, অমেরুদণ্ডী ১১০৪ টি, একটি হেমিকর্ডাটা সহ মোট ১৫৮৬ টি প্রাণী প্রজাতি এখানে পাওয়া যায়। তাছাড়া ৩৬ টি প্রজাতির পাখি ছাড়াও, আরও ১৪/১৫ ধরনের পরিযায়ী পাখি এখানে আসে[২]।

এছাড়া সুন্দরী, গরান, কেওড়া, হেঁতাল, খলসি, পশুর, বাইন প্রভৃতি সব ম্যানগ্রোভ অরণ্যে সমৃদ্ধ, উদ্ভিদ সম্পদে সমৃদ্ধ এই সুন্দরবন তথা সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্র। মাতলা, ইছামতি, বিদ্যাধরী, রায়মঙ্গল, কালিন্দী, সপ্তমুখী ইত্যাদি সব উল্লেখযোগ্য নদী ও অফুরন্ত প্রাণীজ ও সামুদ্রিক সম্পদে ভরপুর সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্র। এই বাস্তুতন্ত্রকে ঘিরেই বর্তমানে ৫০ লক্ষ[৪] মানুষের জীবন ধারন তথা জীবিকা নির্ধারিত হয়। অনন্যময়তা ও অভাবনীয় সৌন্দর্যে ভরপুর এই সুন্দরী সুন্দরবনেই দেশ-বিদেশ থেকে আসে হাজার হাজার ভ্রমণকারী, পর্যটক, প্রকৃতিপ্রেমী। সুন্দরবনের গভীর অরণ্য হয়ে ওঠে সুন্দরবনবাসীর নিকট এক অর্থ উপার্জনের ভাণ্ডার। তা সত্ত্বেও লালসা, অর্থ লোলুপতা এবং হিংস্রতা এই ভয়াল-ভয়ঙ্কর সুন্দরী সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের বিনাশে উদ্ধত। সুন্দরবন সম্পর্কিত জনসচেতনতা ও কার্যকরী প্রচারই হবে ভবিষ্যতের সুন্দরবন বাঁচিয়ে রাখার উপযুক্ত প্রয়াস।

সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্র কেন্দ্রিক পর্যটন শিল্পঃ

মহাকাশের থেকে দেখলে মহাবিশ্বের শূণ্যস্তরে যে নীলগ্রহকে দেখা যায় আসলে সেটাই আমাদের পৃথিবী। এই নীলগ্রহকে দেখা সম্ভব হয়েছে বিজ্ঞানীদের মহাকাশে পাড়ি দেওয়ার ভ্রমণ পিপাসু মানসিকতা থেকেই। আর এই নীলাভ পৃথিবীর বুকে জীবের যে স্বছন্দ বিচরণ যাকে আক্ষরিক অর্থে ভ্রমণ-পর্যটন বলে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। জীব-জগৎ বলতে পশু-পাখি-খেচর শ্রেণীর বিচরণ যা কিনা প্রকৃতির আপন নিয়মে, কিন্তু মানব সমাজের বা মানুষের বিচরণ, যা কিনা স্থান থেকে স্থানান্তরে, দেশ থেকে দেশে বা স্বদেশ থেকে বিদেশে তা আসলে মানুষের আত্মসুখের। মনের ক্লান্তি আর অবসাদকে দূরে সরাতে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। আর এটাকেই আমরা ভ্রমণ বা

পর্যটন বলে থাকি। মানুষের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এই পর্যটন পিপাসা লুকায়িত রয়েছে। কেবল সুযোগ আর সময় এলে তা প্রকাশ পায়। দৃষ্টিসুখ পাওয়ার বাসনা থেকেই মানুষ বিশ্বের দরবারে আসন পাতে। আর সেই আসনটা যদি সবুজে ঘেরা বনানী আর সৌন্দর্যতায় ঘিরে থাকে এবং মন যদি প্রকৃতি প্রেমি হয়, তবে সেই আসনটা হয়ে ওঠে হাতে চাঁদ পাওয়ার মতো একটা ব্যাসবাক্য।

অস্বীকার করার উপায় নেই আমাদের এই সুন্দরবন, তথা ভারত ও বাংলাদেশের সম্মিলিত সুন্দরবন পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য। এখানকার জীব বৈচিত্র্য পৃথিবীর সমস্ত মানুষের কাছেই আকর্ষণের বিষয়বস্তু। যে কারণেই বোধ হয় সুন্দরবন ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ এর মর্যাদা লাভ করে। পশ্চিমবাংলায় এটি একমাত্র বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ[৩]। তাছাড়া ১৯৭০ সালে ইউনেস্কো-র সাধারণ সভায় ম্যান অ্যান্ড বায়োস্ফিয়ার (এমএবি) কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। ভারতের বন এবং পরিবেশ মন্ত্রক এই কর্মসূচীর অধীনে সুন্দরবনের ৯৬৩০ বর্গ কিলোমিটার বনাঞ্চল এমএবি কর্মসূচীর মধ্যে নিয়ে আসেন। একই বছর সুন্দরবন ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের মর্যাদা পায়।

২০০১-এ ইউনেস্কো এই বনাঞ্চলকে ওয়ার্ল্ড নেটওয়ার্ক অফ্ বায়োস্ফিয়ার এর আওতায় নিয়ে আসে[৪]। যাইহোক সুন্দরবনের মর্যাদার বিকাশের জন্য তার এই স্বর্ণপালকের হয়তো বা প্রয়োজন ছিল। আসলে সুন্দুরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের প্রকৃতি ছিল এরকম। ভ্রমণ পিপাসু প্রকৃতি প্রেমী তথা সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের রুপময় গন্ধ আহরণকারী পর্যটকরাই এর স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। কারণ সুন্দরবন প্রকৃতির নিয়মে আপন খেয়ালে কোটি কোটি বছরের প্রচেষ্টায় নিজেকে সজ্জিত করে সমর্পণ করেছে ধরিত্রীকে। আর তাই তো মানুষ সৃষ্টিসুখের উল্লাসে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে মিলিত হয়েছে সুন্দরবনে। যে কারনেই গভীর বাস্তুতন্ত্র কেন্দ্রিক সুন্দরবনের যে পরিবেশ তা বৃহৎ আকারে পর্যটন থেকে পর্যটন শিল্পে রূপান্তরিত হয়েছে। বলা হয়ে থাকে যে,

“মানুষ জন্মগত ভাবে অনুসন্ধিৎসু ও কৌতুহলী এবং কারিগরি ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নতির সাথে সাথে বর্তমান বিশ্ব পর্যটন খ্যাত একটি অতি সম্ভাবনাময় বিশাল অঙ্কের অর্থকরী শিল্প হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে”[৫]।

তাছাড়া এই পর্যটন শিল্প থেকেই ভারত, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, মালদ্বীপ, ইরান, তুরস্ক, চীন, কাজাখস্থান, আরব-আমিরাত, ভুটান, সিঙ্গাপুর, কাতার, ইন্দোনেশিয়া, সৌদি আরব প্রভৃতি রাষ্ট্র অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনেক সমৃদ্ধ হচ্ছে। যে কারণেই আমাদের এই সুন্দরবন তথা সুন্দরবন কেন্দ্রিক গভীর বাস্তুতন্ত্রের পর্যটন শিল্প আজ বিশ্বের প্রতিটি কোনায় নিজেকে স্থান দিতে পেরেছে, তা হল তার দেহে অবস্থানরত ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ সম্পদ ও প্রাণী সম্পদ এর বিশাল সম্ভার। পর্যটন শিল্পকে কেন্দ্র করে সুন্দরবন তথা সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের মর্যাদা হয়তো বেড়েছে, তবুও অরণ্যের স্বাভাবিক অবস্থা কিছুটা হলেও বলা যায় পুরটাই পাল্টে গেছে। আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্র। একটা প্রশ্ন তৈরি হয়েছে সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রকে ঘিরে, যে সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্র থাকবে তো? কারণ ডীপ ইকোলজি যে নীতির কথা বলে, যে ভারসাম্যের কথা বলে তা সুন্দরবনের নানান সমস্যার বাতাবরণে ভারসাম্য ব্যাপারটা হারাতে বসেছে। ভারসাম্য বিঘ্নিত হলে সুন্দরবন হারিয়ে যাবে। আর সুন্দরবন হারালে পশ্চিমবঙ্গের ভৌগলিক চেহারাটাই বদলে যাবে।

যাইহোক নানান সমস্যার ভারে জর্জরিত হয়েও পর্যটন শিল্পে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দেশকে ও দেশের মানুষকে সমৃদ্ধ করছে আমাদের এই সুন্দরবন তথা সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্র। এই গভীর বাস্তুতন্ত্রকে ঘিরেই কিন্তু অভাবনীয় সৌন্দর্য ও অরণ্যময়তা কেন্দ্রিক ভয়ংকরতা বিরাজমান। তাই এই গভীর বাস্তুতন্ত্রকে কেন্দ্র করে সুন্দরবনে গড়ে উঠেছে পর্যটন শিল্প। গবেষণা কাজের সহায়তায় বা

গবেষণার সন্দর্ভের অগ্রবর্তীতায় গভীর বাস্তুতন্ত্র কেন্দ্রিক সুন্দরবনের অভ্যন্তরে দর্শনীয় বিভিন্ন স্থানের পর্যালোচনায় গবেষণা সন্দর্ভের সঠিক প্রয়াস কার্যকরী হবে। সুন্দরবনের এই পরিচিতি আজ বিশ্বের প্রতিটি কোণায় পৌঁছে গেছে। কারণ অবশ্য যতদিন যাচ্ছে এর প্রচার ও পরিকল্পনা ততই বাড়ছে। এত বৈচিত্র্যময়তা ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীতে বিরল। সেকারনেই গভীর বাস্তুতন্ত্র কেন্দ্রিক সুন্দরবনের খ্যাতি আজ বিশ্বজুড়ে। সর্বমোট দ্বীপ সংখ্যা ৫৬ কিংবা ১১৯টি বাঘ জঙ্গলের ছোটো বড়ো দ্বীপ মিলিয়ে, ৩১ টি নদ-নদী ও অজস্র সূতিখাল নিয়ে সবুজ অরণ্যের রাজধানী হল আমাদের এই ভয়াল ভয়ংকর বিচিত্র সুন্দরবন। প্রায় ২৬০০০ বর্গকিলোমিটার জোয়ার ভাটা প্রভাবিত বিশালাকার গভীর বাস্তুতন্ত্র নিয়েই সুন্দরবন। ভারতীয় সুন্দরবন প্রায় সর্বমোট ৯৬৩০ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়েই অবস্থিত[৬]।

গভীর বাস্তুতন্ত্রের এই বৃহৎ পরিমণ্ডল নিয়েই সুন্দরবনের পর্যটন শিল্প। সাধারণত সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রকে উপভোগ করার সময় মূলত শীতকাল, ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী। যদিও অক্টোবর মাস থেকে পর্যটকদের মধ্যেই পর্যটন দামামা বেজে ওঠে। তাছাড়া সজনেখালি বার্ড সাংচুয়ারি দেখার আদর্শ সময় হল জুলাই মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাস। সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রকে ঘিরে রচিত পর্যটন কেন্দ্রগুলি হল, সজনেখালি ম্যানগ্রোভ ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টার, সজনেখালি ম্যানগ্রোভ পার্ক, ডোবাঁকি, নেটিধোপানি, বুড়ির ডাবরি, ঝিঙ্গেখালি, বণিক্যাম্প, কলসদ্বীপ, মরিচঝাঁপি, ভগবৎপুর কুমীর প্রকল্প, লোথিয়ান দ্বীপ, জটার দেউল, গঙ্গাসাগর, বকখালি, হ্যালিডে দ্বীপ, কৈখালী, হরিণডাঙ্গা ইত্যাদি। সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্র কেন্দ্রিক বাদাবন এলাকার বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রে পৌঁছালে যে সমস্ত বস্তুর দৃশ্য নয়নে দৃষ্টিসুখের সঞ্চার ঘটাবে তা হল- সুন্দরী, গরান, হেঁতাল, গর্জন, পশুর, গোলপাতা, গেঁওয়া, খলসে, কাঁকড়া প্রভৃতি ৫০ টির মতো প্রজাতির ম্যানগ্রোভ। একটা সময় ছিল যখন সুন্দরবনের

গভীর বাস্তুতন্ত্রে বিচরণ করতো স্বর্ণমৃগ (মুনটিজানুস মুনটিজ্যাক), বুনোমহিষ (বুবালাস বুবালিস), জাভা দেশীয় গণ্ডার (রিনোসেরাস সন্ডিকাস), একশৃঙ্গ গন্ডার (রিনোসেরাস ইওনিকরনিস), এবং জলার হরিণ (সারভাস ডুভেসেলি), যদিও কালের প্রবাহে এরা অবলুপ্ত। কিন্তু এদের স্মৃতি বিরাজ করছে জাদুঘরে ও সংগ্রহশালাতে। বর্তমানে গভীর বস্তুতন্ত্রের সৌন্দর্য ও ভয়ংকরতা টিকিয়ে রেখেছে মানুষখেকো রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার (প্যানথেরা টাইগ্রিস টাইগ্রিস), হিংস্র নোনা নদী মোহনার কুমির (ক্রোকোডিলাস পোরোসাস), মেছোবিড়াল, বনবিড়াল, শুশুক, বাঘরোল, সজারু, বাদুর, ডাঁস মৌমাছি, কয়েক প্রজাতির কচ্ছপ, বাদাবনের প্রায় ৩৫০টি প্রজাতির পাখি এর মধ্যে পরিযায়ী ২৮/৩০ প্রজাতির পাখি এখানে বাসা বাঁধে। নদীতে পাওয়া যায় বেশ কিছু মৎস্য সম্পদ, যেমন- ইলিশ, ভেটকি, পারশে, ভাঙন, ট্যাংরা সহ অনেক প্রজাতির মাছ ও কাঁকড়া। সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রে প্রচুর নদীর অবস্থান পরিলক্ষিত হয় যেমন- আদিগঙ্গা, আঠারোবাকি, আতাই, কলাগাছি, কালিন্দী, গরাল, ঝিলা, পুরন্দর, মাতলা, রায়মঙ্গল, বিদ্যাধরী, মনি নদী, মাথাভাঙ্গা, বিদ্যা, হাতিয়াভাঙা, হাতানিয়া-দোয়ানিয়া, মুড়িগঙ্গা, ঠাকুরান,গোসাবা প্রভৃতি।

সুন্দরবন মূলত ব-দ্বীপ এলাকা। তাই এই নদীগুলি প্রতিটি ব-দ্বীপকে একে-অপরের সঙ্গে যুক্ত করেছে, এবং পর্যটনকে উন্নততর করতে তৈরি হয়েছে বেশ কিছু সেতুবাঁধ। যার দ্বারা সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের পর্যটন কেন্দ্রে যাতায়াত বেড়েছে। সাম্প্রতিককালেই প্রায় ৩৪ টির মতো সেতু বাঁধ নির্মিত হয়েছে, যা গভীর বাস্তুতন্ত্রের গভীর অরণ্যে পৌঁছানো পর্যটকদের সুবিধাই হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য কিছু সেতুর নাম নিম্নে দেওয়া হল-

১। মনি নদীর ওপরে রায়ধিঘি-কঙ্কনদীঘি মনি সেতু।

২। বিদ্যাধরী নদীর ওপর চৈতল সেতু।

৩। বিদ্যাধরী নদীর ওপর হাড়োয়া সেতু।

৪। গঙ্গাধরপুরে সপ্তমুখী নদীর ওপরে সপ্তমুখী সেতু।

৫। মৃদঙ্গভাঙ্গা নদীর ওপর সেতু।

৬। পিঁপড়াখালি নদীর ওপর সন্দেশ খালি-বাসন্তি সেতু।

৭। সোনাখালি-বাসন্তি সংযোগকারী হোগল নদীর ওপর হোগল সেতু।

৮। মাতলা নদীর ওপর মাতলা সেতু(সুন্দরবনের দীর্ঘতম সেতু)।

৯। পিয়ালী নদীর ওপর পিয়ালী রেল সেতু।

১০। কালনাগিনী নদীর ওপর রেল সেতু।

১১। কুলতলিতে পেটকুলচাঁদ নদীর ওপর সেতু।

১২। মথুরাপুর-পাথর প্রতিমা সংজোগকারী রায়পুর সেতু।

১৩। মথুরাপুরে জয়নালের সেতু।

১৪। হাসনাবাদে কা্টাখালি নদীর ওপর সেতু।

সেতুগুলি[৭] ব-দ্বীপ গুলিকে সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে একে-অন্যের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। পর্যটকেরা সহজেই একস্থান থেকে অন্যস্থানে পৌঁছতে পারে। নিম্নে বেশ কিছু পর্যটন কেন্দ্রের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হলাম। যারা সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রকে বিশ্বের মাঝে ধ্বজা তুলে ধরতে শিখিয়েছে। ভ্রমণ-পর্যটনের উল্লেখযোগ্য স্থান গুলির বিবরণ নিম্নে আলোচিত হল-

ব্যাঘ্র প্রকল্পঃ গভীর বাস্তুতন্ত্র কেন্দ্রিক সুন্দরবনের ব্যাঘ্র প্রকল্পের আয়তন মোটামুটি ২৫৮৫.১০ বর্গকিলোমিটার। এই প্রকল্প এলাকাটির কোর এলাকার আয়তন ১৩৩০ বর্গ কিলোমিটার এবং বাফার এলাকার আয়তন ৮৮৫ বর্গ কিলোমিটার। এই দুটি ভাগে প্রসারিত হয়েছে। কোর এলাকার অন্তর্গত

গোসাবা, মাতলা, মায়াদ্বীপ, ও চামটা, গোনা ইত্যাদি যেখানে বিশেষ অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ নিষিদ্ধ। বাফার এলাকার অন্তর্গত পীরখালী, ঝিলা, খাটুয়াঝুরি, বুড়িডাবরি, নেতিধোপানি, চাঁদখালি যেখানে ফরেস্ট অফিস থেকে পারমিট নিয়ে মউলে, জেলে, বাউলেরা যাওয়ার অনুমতি পায়। ১৫ টি ব্লক নিয়েই এই প্রকল্পের অবস্থান। সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের বাইন, গেঁওয়, কাঁকড়া, সুন্দরী, হেঁতাল, গোলপাতা, বরুনা ঘাস এবং বাঘ, কুমীর, কাঁকড়া, হরিণ প্রভৃতি সব উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্পদের সমন্বয় এখানে। তাছাড়া পরিযায়ী ও স্থানীয় পাখিদের দেখাও এখানে মেলে।

সজনেখালি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যঃ মাতলা ও গোমতি নদীদ্বয়ের মিলন স্থলেই ৩৬২.৪০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে সজনেখালি ব্যাঘ্র সংরক্ষণ এলাকাটির বিস্তার। এখানে বন্যপ্রকৃতি ছাড়া আকর্ষণের মূল জায়গা হল পাখি। যা গভীর বাস্তুতন্ত্রের পর্যটন পরিবেশকে সুন্দর করে তোলে। এখানে একটা সময়ে হেরন প্রজাতির সারস দেখা যেত। ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টার নামাঙ্কিত একটা গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে। তাছাড়া ওয়াচ টাওয়ারে দাঁড়িয়ে অবলোকন করা যায় সজনেখালি অভয়ারণ্যের পরিযায়ী পাখি থেকে শুরু করে বন্য বরাহ, চিতল হরিণ, কুমীর, রাজকীয় রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার হল এখানকার বাসিন্দাবৃন্দ।

লোথিয়ান দ্বীপ বন্য প্রাণী অভয়ারণ্যঃ ৩৮ বর্গকিলোমিটার এলাকা নিয়ে বঙ্গোপসাগরের নিকট সপ্তমুখী নদীর মোহনায় এই বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যটির অবস্থান। এখানকার সূর্যাস্ত দর্শন পর্যটকদের আত্মসুখে ভরিয়ে তুলবে। এখানে অবশ্য বাঘের অস্তিত্বের কোন স্থান নেই। ম্যানগ্রোভের সারির মধ্যেই বৃক্ষ গুলিকে আলাদা আলাদা ভাবেই চেনার খুব ভাল জায়গা এই লোথিয়ান দ্বীপ। গাঙ্গেয় ডলফিন ও মোহনার কুমির এবং বুনো শুয়োর দর্শক মনে রোমাঞ্চ তৈরী করবে।

পথ নির্দেশঃ- নামখানা থেকে এই স্থানে যাওয়া যায়।

যোগাযোগঃ- বিভাগীয় বনাধিকারিক, দঃ ২৪ পরগনা বিভাগ, ৩৫ গোপালনগর রোড, কোলকাতা-২৭।

নেতিধোপানিঃ-সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের এই পর্যটন কেন্দ্রটি সুন্দরবনের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত। এই নেতিধোপানি-র একেবারেই দক্ষিণে কোর এলাকা। পর্যটকদের প্রবেশ একেবারেই

নিষিদ্ধ। বিগত প্রায় ৪০০ বছরের একটি পুরানো মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ সহ একটি ওয়াচ টাওয়ার এখানে দেখা যায়। কথিত আছে যে এই মন্দিরের কর্ত্রী নেতা নামক এক নারি। যিনি বেহুলা লক্ষ্মীন্দর কাহিনীর শিবের মানস কন্যা মনসার সহযোগী ছিলেন। বকুল গাছের সারি পর্যটকদের সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের ধারনা সম্পর্কে আলাদা একটা জায়গা তৈরি করাতে পারবে।

পথ নির্দেশঃ- শিয়ালদহ স্টেশন থেকে ট্রেন যোগে ক্যানিং আসতে হবে। সেখান থেকে পৌঁছোনো যাবে এখানে।

দোবাঁকিঃ সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের এক গুরুত্বপূর্ণ অভয়ারন্য এটি। সজনেখালি অভয়ারণ্য থেকে আড়াই ঘণ্টা দূরত্বে এই অভয়ারণ্যটি সজনেখালির দক্ষিন-পশ্চিম অংশে অবস্থিত। দোবাঁকি অভয়ারণ্যতে রয়েছে একটি হরিণ অভিযোজন কেন্দ্র। যা অন্য দর্শনীয় পর্যটন কেন্দ্র গুলির থেকে দোবাঁকি কে গভীর বাস্তুতন্ত্রের অংশ হিসাবে অন্য মাত্রা এনে দিয়েছে। এই অভিযোজন কেন্দ্রে চিতল হরিণের চিকিৎসা, বংশবৃদ্ধি এবং ম্যানগ্রোভ অরণ্যে অভিযোজিত করার কাজ হয়। এখানে একটা ওয়াচ টাওয়ার রয়েছে যা থেকে ছড়িয়ে থাকা ম্যানগ্রোভ অরণ্যকে চাক্ষুস করা যায়। বাঘ, বুনশুয়োর ও চিতল হরিনের সংস্পর্শে আসা যায়।

হ্যালিডে দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারন্যঃ মাতলা নদীর বুকেই গড়ে উঠেছে দ্বীপটি। প্রায় ৫.৯৫ বর্গকিলোমিটার জায়গা জুড়েই এর বিস্তার। সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের ভাঙা গড়ার খেলায় আজ দ্বীপটি ক্রমশ তার আয়তন হারাচ্ছে। মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই নিজেকে গভীর বাস্তুতন্ত্রের অংশ হিসাবে তুলে ধরেছে। ম্যানগ্রোভ অরণ্যের অন্তর্ভুক্ত এটি। চিতল হরিণ ও বন্য বরাহ-এর পাশাপাশি এই বাস্তুতন্ত্রে আগমন ঘটে বাঘের। ১৯৭৬ সালে এটি গড়ে ওঠে।

পথ নির্দেশঃ- জলপথে রায়দিঘি থেকে এই অভয়ারণ্যের দূরত্ব মোটামুটি ৫০ কিলোমিটার।যোগাযোগঃ- বিভাগীয় বনাধিকারিক দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বনবিভাগ ৩৫, গোপালনগর রোড, কোলকাতা- ২৭।

নরেন্দ্রপুর বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যঃ কলকাতার খুবই কাছেই এই অভয়ারণ্যটি বেনেবৌ, টুনটুনি, অঞ্জনা, মুনিয়া প্রভৃতি সব বিভিন্ন প্রজাতির পাখিদের আশ্রয়স্থল। সোনারপুরের কাছেই গড়িয়া ক্যানিং রোডের পাশেই অবস্থিত। সোনারপুর-রাজপুর পৌরসভার অন্তর্গত এটি। যোগাযোগঃ- বিভাগীয় বনাধিকারিক, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ৩৫, গোপালনগর রদ, কোলকাতা-২৯।

বুড়িরডাবরিঃ সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের বাঘ সংরক্ষণ এলাকার একেবারেই পূর্বপ্রান্তে অবস্থান এই অভয়ারণ্যটির। অভয়ারণ্যটি একেবারেই বাংলাদেশ সীমান্তের পাশেই। এটি পরিচিত হয়ে আছে রায়মঙ্গল ভিউ পয়েন্ট নামেই। পর্যটকদের আলাদা এক অনুভুতির জায়গা এই বুড়ির ডাবরি। কারণ এখানে বাঘ ও মানুষের বিশেষ করে পর্যটকদের মধ্যে সাক্ষাৎ খুবই কাছ থেকে হয়। দুরত্ব কেবলমাত্র উভয়ের মধ্যেকার একটা নিরাপদ সূচক জাল। রায়মঙ্গল ভিউ পয়েন্ট-এ উঠলেই পর্যটকরা রায়মঙ্গল নদীটির ওপার সীমানা দেখতে পাবে। রায়মঙ্গল নদীই এখানে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যেকার সীমান্তের সূচক। নদীর ওপারের বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত সুন্দরবনকে দেখতে পাওয়া যায়[৮]।

জটার দেউলঃ উত্তর ভারতের নাগররীতি অনুসারী, পালযুগে নির্মিত স্থানীয় মানুষের নামাঙ্কিত ৮০/৮৫ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট শিবমন্দির যা কিনা জটার দেউল নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। আজ সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্র। মথুরাপুর থানার ১১৬নং লাটে প্রাপ্ত জটার দেউলটির ঐতিহাসিকতা রয়েছে। ১৮৫০ সালের ২৪ পরগনার রেভেনিউ সার্ভেয়ার মি. আর.

স্মিথ সুন্দরবন দ্বিতীয়বার জরিপ করেন। প্রথমবারে জরিপ কালেই মি. আর. স্মিথ ১১৬ নং লটে জটার দেউল মন্দিরটি আবিষ্কার করেন। ৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে তৈরী এই জটার দেউল[৯]। প্রাপ্ত লিপির ভিত্তিতে জানা যায় যে রাজা জয়চন্দ্র ৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে এটি তৈরি করেছিলেন[১০]। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত রায়দিঘির মনি-নদীর ফেরী পেরিয়ে কঙ্কনদীঘি অঞ্চলের প্রাচীন সুন্দরবনের ১১৬ নং লটে পশ্চিমজটা গ্রামে এই দেউলটি অবস্থিত। হান্টার সাহেব এই দেউলকে বৌদ্ধ মন্দির বা প্যাগোডা বলেছেন, যাইহোক বিশালাকার এই মন্দিরটি বহু পর্যটকদের কাছেই আকর্ষণের জায়গা। এ এস আই কর্তৃক অধিগ্রহনের পূর্বে ডঃ টি ব্লক (ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ) ১৯০৮-এ মন্দিরটি পরিদর্শন করেন এবং প্রায় ৯ হাজার টাকার আনুদান দেন। তাছাড়া মন্দিরটির আগাছা পরিষ্কারের জন্য তিনি মাসিক ৩৪ টাকা করে ব্যায়ের হিসাব অনুমোদন করেন[১১]।

ভগবতপুর কুমির প্রকল্পঃ একটা সময়কালে নির্বিচারে সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্র থেকে শিকারের কারণে, মোহনাবাসী কুমিরের সংখ্যা হ্রাস পায়। বর্তমানে কুমির সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের লুপ্ত প্রায় প্রাণী। ১৯৭৬ সালে এদের বংশবৃদ্ধি ঘটানো এবং পরিসংখ্যানে জোয়ার আনতে সপ্তমুখী নদীর উত্তরপাড়ে ভগবতপুর নামক স্থানে তৈরি হয় এই কুমির প্রকল্প। বিভিন্ন আকারের কুমির দেখার সুযোগ আছে পর্যটকদের এখানে। প্রায় ৩৭০ টি কুমিরকে বড়ো করে জলে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

পথ নির্দেশঃ শিয়ালদহ থেকে ট্রেন-এ করে কাকদ্বীপ স্টেশন। বাসে করে আসতে হবে পাথরপ্রতিমায়। সেখান থেকে মটরভ্যানে ভগবতপুর। তাছাড়া নামখানা থেকে নৌকাপথে ও আসা যায়।

বকখালিঃ কলকাতা থেকে বকখালির দুরত্ব প্রায় ১৩০ কিলোমিটার। নামখানা থেকে হাতানিয়া-দোয়ানিয়া নদী পেরিয়ে বকখালিতে পৌঁছানো যায়। বর্তমানে এই নদীর ওপর নব নির্মিত সেতুর সাহায্যে খুবই দ্রুত পর্যটকরা পৌঁছাবেন এই পর্যটন কেন্দ্রে। এখানকার ঝাউবনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সমুদ্র সৈকত পর্যটকদের কাছে পরম সুখকে খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

পথ নির্দেশঃ শিয়ালদহ থেকে ট্রেন-এ নামখানা স্টেশন এবং এখান থেকে বাসে করে বকখালি। তাছাড়া কলকাতা থেকে সরাসরি বাসে করে এই পর্যটন কেন্দ্রে পৌঁছানো যাবে।

গঙ্গাসাগরঃ লোকমুখে একটা কথা এখন প্রবাদে পরিনত হয়েছে 'সব তীর্থ বারবার কিন্তু গঙ্গাসাগর তীর্থ একবার'। সত্যি কথা বলতে কি নানান ঝুঁকি ও বাধা পেরিয়ে হাজার হাজার দর্শনার্থী এসে ভিড় জমায়। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার শেষ সীমান্তে অবস্থিত সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের বৃহত্তম দ্বীপ সাগরদ্বীপ, ২২৪.৩ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে বর্তমানে ২০১১ জনগননা অনুযায়ী প্রায় ২,১২,০৩৭ জনের লোকসংখ্যা নিয়ে দ্বীপটি বঙ্গোপসাগরের ওপর ভাসছে। এই দ্বীপের সর্বদক্ষিণের অংশ গঙ্গাসাগর। মহামুনি কপিলকে ঘিরেই এবং বলা যায় কপিলমুনিই হলেন গঙ্গাসাগরের মূল আকর্ষণ। পঞ্চতীর্থ স্থানের শ্রেষ্ঠ তীর্থ এটি। সাগর স্নানে অর্জিত হয় সাফল্য, মুক্তি পাওয়া যায় পুনর্জন্ম থেকে। সেই সফলতা প্রাপ্তির জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান-প্রান্তর থেকে পৌষ সংক্রান্তির কনকনে ঠাণ্ডায় মলিনমুক্ত হতে ছুটে আসে জনস্রোত। তাছাড়া গঙ্গাসাগর পরিচিত হিন্দুদের পবিত্র স্থান হিসাবে। বিশেষ এই দিনে ৪/৫ লক্ষ পুন্যারথিরও বেশি সমাগম ঘটে। গঙ্গাসাগর কেবলমাত্র তীর্থভূমি-ই নয় সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের এক উল্লেখযোগ্য পর্যটন কেন্দ্রও। কপিলমুনির মন্দিরকে ঘিরে এখানে গড়ে উঠেছে মঠ, আশ্রম, বিভিন্ন মন্দির। প্রায় ১৫০০ বছরের পুরানো এই কপিলমুনি ও মন্দির।

পথ নির্দেশঃ ডায়মণ্ডহারবার থেকে সাগর দ্বীপের দুরত্ব ৬৪ কিলোমিটার। ডায়মণ্ডহারবার থেকে বাসে কাকদ্বীপ। কাকদ্বীপ থেকে জলযানে সাগরদ্বীপের উত্তরে কচুবেড়িয়া, এখান থেকে হাঁটাপথে সাগরদ্বীপ।

সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন সব অভয়ারণ্য ও বেশকিছু জায়গা কে ঘিরেই কিন্তু এই পর্যটন শিল্প। এছাড়াও তিলপির বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ (পিয়ালী), বাইনচাপড়ার শিবমন্দির (মন্দিরবাজারের), মজিলপুরের ধন্বন্তরি কালীমন্দির, ময়দা কালী মন্দির এবং জয়নগরের মিত্র পাড়ার দ্বাদশ মন্দির ও পর্যটকদের কাছে আকর্ষণের জায়গা। অরণ্যের মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক শোভা, বিভিন্ন প্রজাতির পাখি, হরিণ, বনের বাঘ, শুকর, মোহনার কুমীর, গাঙ্গেয় ডলফিন, ঝলমলে বালুচর এবং দিনের শেষে প্রাকৃতিক সূর্যাস্ত পর্যটকদের মানসপটে শতত যুগ ধরে বিরাজমান থাকবে। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে শিল্প বিপ্লবের হাত ধরে বেশকিছু পরিবর্তন ঘটে। এর সাথে সাথে সভ্যতার বিকাশের পথ ধরে আধুনিক পর্যটনের ধারনা উঠে আসে। এই পর্যটন জোয়ার ভারতবর্ষকেও প্লাবিত করে। তৎকালীন ভারত সরকার ১৯৪৫ সালে গঠন করেন সার্জেন্ট কমিটি। এই কমিটির হাত ধরে পর্যটন কেন্দ্র গুলিতে পর্যটকদের সুবিধা ও আসুবিধার দিকটিও আলোকপাত করা হয়। ১৯৮৬ সালে পর্যটনের বিকাশের জন্য তৈরি হয় ন্যাশনাল কমিটি অন ট্যুরিজম। পুঁজিবাদের বিকাশের সঙ্গে পরিবর্তন আসে পর্যটন-এ। পর্যটনের চরিত্র পাল্টে এল গণ-পর্যটন। আর এখানেই পর্যটন পরিণত হয়েছে শিল্পে। এই পর্যটন শিল্পের হাত ধরেই সুন্দরবন তথা সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের পরিচিত বিশ্বের দরবারে ছড়িয়েছে।

পৃথিবীর মানচিত্রে সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের অংশ হিসাবে ম্যানগ্রোভ, বনজসম্পদ, প্রাণীসম্পদ, আজ চর্চিত বিষয়। তাই একদিকে উন্নয়নের জোয়ার আর অন্যদিকে আইনের বাঁধনে আবদ্ধ সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্র। নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন সব বিবিধ প্রকল্প যথা,

১। সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ, ১৯৭৩ সাল।

২। সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প, ১৯৭৩ সাল।

৩। সুন্দরবন কুমীর প্রকল্প (ভগবতপুর), ১৯৭৬ সাল।

৪। সজনেখালি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ঘোষণা, ১৯৭৬ সাল।

৫। লোথিয়ান দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ঘোষণা, ১৯৭৬ সাল।

৬। হ্যালিডে দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ঘোষণা। ১৯৭৬ সাল।

৭। সুন্দরবন জাতীয় উদ্যান রূপে ঘোষণা। ১৯৮৪ সাল।

৮। সুন্দরবন জীব পরিমণ্ডল ঘোষণা, ১৯৮৪ সাল।

৯। সুন্দরবনকে ওয়ার্ল্ড ন্যাচারাল হেরিটেজ সাইট ঘোষণা, ১৯৮৪ সাল।

সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রকে ঘিরেই যে পর্যটন কেন্দ্র তৈরী হয়েছে এবং তাকে আরও প্রশংসিত করতে "বাংলা"-র ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট কাজ করছে। একই ভাবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও চাইছেন সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রকে ঘিরেই পর্যটনে জোয়ার আসুক। সেকারণেই ২০ শে ডিসেম্বর ২০১২ তে দেশের শিল্পপতিদের নিয়ে পর্যটন সংক্রান্ত আলোচনা চলেছিল 'পর্যটনে জোয়ার আনতে

রাজ্যের সম্মেলনে বিদেশিরা' শীর্ষক প্রতিবেদন সেই সংক্রান্ত ইতিবাচক প্রয়াস তৈরী হয়েছে পর্যটনের শিল্পকে আরও সমৃদ্ধ করতে[১২] এই ইতিবাচক পদক্ষেপ একদিকে যেমন হয়তবা পর্যটন শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হবে, শুধু তাই নয় সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের মনুষ্য সম্প্রদায়ের কর্মসংস্থানের একটা জায়গা তৈরি হবে। কিন্তু একটা প্রশ্ন সর্বদা ঘুরপাক খাচ্ছে যে সুন্দরবন কেন্দ্রীক আমাদের এই গভীর বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য কি ঠিক থাকবে? কারণ পর্যটন শিল্পের সম্প্রসারণ মানেই কিন্তু আরও বেশি বেশি পরিমানে সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রে প্রবেশ করবে পর্যটক। পর্যটন কেন্দ্র গুলিতে জনজোয়ার তৈরি হবে। অরণ্যের স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট হবে। অসচেতন ভাবেই ক্ষতির সম্মুখিন হবে উদ্ভিদ ও বন্যপ্রাণী সম্পদ। অবশ্য পরিবেশকে বাঁচিয়ে নতুন ভাবে পর্যটন আত্মপ্রকাশ করেছে ২০০২ সালে। যাকে ইকো-ট্যুরিজম বা পরিবেশ বান্ধব পর্যটন বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে।

এখানে পর্যটন শিল্পের সাথে পরিবেশ ভাবনাকে, পরিবেশ সচেনতাকে যুক্ত করে তৈরি করা হয়েছে ইকো-ট্যুরিজম। বর্তমানে বিশ্বের মানুষের কাছেই একেবারেই আধুনিক এক মননশীল ইতিবাচক চিন্তা চেতনা। তাছাড়া এই পরিবেশ বান্ধব পর্যটন শিল্পকে আরও জনপ্রিয়তা দান করেছে। এই মননশীল চিন্তা চেতনা খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে তাদের কাছে, যারা পরিবেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য ও বাস্তুতন্ত্রের বিষয়ে অত্যন্ত চিন্তিত।

বিশ্ব পর্যটন সংস্থা-র বর্ণনা অনুসারে ইকো-ট্যুরিজম হল নির্জন প্রকৃতির ছায়া ঘেরা আঁচলের নীচে এক মনোরম পরিবেশে অবসর যাপন[১৩]। সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রকে ঘিরে এ ধরনের চিন্তা ভাবনা অবশ্য সুচিন্তকের সুচিন্তিত ভাষ্য। সুন্দরবনে পরিবেশ বান্ধব পর্যটন বা ইকো-ট্যুরিজম এর বেশ কিছু উপাদান ও সুযোগ সুবিধা রয়েছে। যথা- ১। সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্র কেন্দ্রীক জাতীয়

উদ্যান, অভয়ারণ্য ও প্রাকৃতিক পরিবেশ যা ইকো-ট্যুরিজম এর আকর্ষণ। ২। এই ধরনের পর্যটন পরিবেশগত, সামাজিক, সংস্কৃতি এবং অর্থ নৈতিক দিক থেকেও অনেক লাভজনক। ৩। সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের আঞ্চলিক মানুষের অংশগ্রহণ পর্যটন শিল্পকে জনপ্রিয় ও নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছে। ৪। এই ধরনের পর্যটনের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ক্ষতির থেকে ও মুক্তি পাওয়া যায়। ৫। আসলে এই পর্যটন পারে সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রে মানুষের মধ্যে সুস্থ এক পরিবেশ রচনা করতে এবং পরিবেশের বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষার ব্যাপারে মানুষকে সচেতন করে তুলতে।

স্থানীয় মানুষ অর্থ উপার্জনের একটা বিকল্প পথের সন্ধান পাবে। তাছাড়া এই ধরনের পর্যটন বন ধ্বংস ও বন্য জন্তুর হত্যার হার হ্রাস করে। তাছাড়া এই পর্যটন আগামী দিনে জাতীর মেরুদন্ড যুব ছাত্র সমাজকে পরিবেশর গভীর বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য ও তাকে রক্ষার ব্যাপারে করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে শিক্ষা দেবে। এ ধরনের পরিবেশ বান্ধব পর্যটন কতটা পর্যটক আনতে সক্ষম হবে তা নিম্নে দুটি সারণিতে তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে আলোচনায় প্রবৃত্ত হলাম।

পশ্চিমবঙ্গে আগত পর্যটকঃ-

বছর	দেশীয় পর্যটক	বিদেশী পর্যটক	সর্বমোট
১৯৯৯	৪৭,০২,০০০	১,৯৯,০০০	৪৯,০১,০০০
২০০০	৪৭,৩৭,০০০	১,৯৮,০০০	৪৯,৩৫,০০০
২০০১	৪৯,৪৩,০০০	২,৮৪,০০০	৫২,২৭,০০০

সুত্রঃ- শ্রীখন্ড সুন্দরবন, দেবপ্রসাদ জানা, পৃষ্ঠা- ৪৫৮

সুন্দরবনের পর্যটক সংখ্যাঃ-

বছর	দেশীয় পর্যটক	বিদেশী পর্যটক	সর্বমোট
১৯৯৯-২০০০	২৮,৬১৯(.৬০%)	৩২৪(.১৬%)	২৮,৯৪৩
২০০০-২০০১	২১,৭৫৮(.৪৫%)	৪১৭(.২১%)	২২,১৭৫
২০০১-২০০২	২৮,৭৭৫(.৫৯%)	২৬০(.০৯%)	২৯.০৩৫

সুত্রঃ- শ্রীখণ্ড সুন্দরবন, দেবপ্রসাদ জানা, পৃষ্ঠা-৪৫

পরিসংখ্যানে অবশ্য তাদেরই সংখ্যা পরিগণিত হয়েছে যারা সুন্দরবনের ব্যাঘ্র প্রকল্পে ভ্রমণ করতে এসেছিলেন। নানান ত্রুটিপূর্ণ সমস্যা ভ্রমণের পথকে বা পর্যটনের পথকে অবরুদ্ধ করেছে।

অবশ্য পর্যটন দেশের অর্থনীতির সম্প্রসারণের একটা দৃঢ় ভিত্তি বলে পরিগণিত হয়। তা সত্ত্বেও অবহেলার শিকার হচ্ছে সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রকেন্দ্রিক পর্যটন শিল্প। যোগাযোগ ব্যবস্থা যদিও পর্যটনের ক্ষেত্রে একটা অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগেই আলোচনা করা হয়েছে বেশ কিছু সেতু দ্বারা সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন দ্বীপগুলিকে সংযুক্ত করা হয়েছে কিন্তু পুরোপুরিভাবে এই কাজে সফলতা আসেনি। তাছাড়া সুন্দরবনের অভয়ারণ্য গুলিতে রাত্রি যাপনের সুব্যবস্থা না থাকায় পর্যটন বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে। এখানে একটা প্রশ্ন মাথা চাড়া দেয় তা হল- যে সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্র নির্দিষ্ট একটা শৃঙ্খলা, একটা ভারসাম্যে আবদ্ধ রয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করতে গিয়ে বদ্বীপ কেন্দ্রীক সুন্দরবনের নদী গুলোর ওপর তৈরি অনিয়ন্ত্রিত সেতু। তার ভারবহন করার সঠিক এক পরিকাঠামো বা ক্ষমতা কি আছে এই গভীর বাস্তুতন্ত্রের?

তাছাড়া দেশী ও বিদেশী পর্যটকরা মূলত পাখি ও জীবজন্তু দেখতেই প্রবেশ করে গভীর এই বাস্তুতন্ত্রে কিন্তু তাদের এই প্রত্যাশা পূরণ হয় না। কারন বন হাসিলকে কেন্দ্র করে যেভাবে সুন্দরবনকে সম্প্রসারণ করা হয়েছে তাতে প্রথম থেকেই হারিয়ে গেছে সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্পদ। সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে ঘিরে দেশী বিদেশী পর্যটকদের সুন্দরবনের প্রতি একটা কৌতুহল জাগ্রত হয়। তাদের সেই প্রত্যাশা তো পূরণ হয় না, তাছাড়া এখানকার অভয়ারণ্য গুলির অনিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খলা আতঙ্ক তৈরি করে পর্যটকদের মধ্যে। ফলে প্রকৃতি প্রেমী ছাড়া সুন্দরবনে কেউ আসতে চায় না। যেটুকুই উদ্ভিদ বা প্রাণী সম্পদ রয়েছে এই বাস্তু তন্ত্রকে ঘিরে, তা আঞ্চলিক মানুষের দ্বারা ও চোরা শিকারের দ্বারা অবলুপ্ত হচ্ছে। ভারসাম্য হারাচ্ছে এখানকার গভীর বাস্তুতন্ত্র।

তাছাড়া পর্যটন কেন্দ্রীক যে পরিবেশ বান্ধব পর্যটন বা ইকো ট্যুরিজমের প্রচেষ্টায় সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রকে উপযুক্ত বিবেচনা করা হচ্ছে, সেই ইকো-ট্যুরিজম-এর ধাক্কায় যদি সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রে তৈরি হয় তারামার্কা হোটেল, তবে হাজার হাজার বৃক্ষ ধ্বংস হবে, বন্যপ্রাণী আশ্রয়ের সন্ধানে বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে। সুন্দরবন ও সুন্দরবনবাসীর মধ্যে যে আত্মিক সম্পর্ক তা হারিয়ে যাবে। সুন্দরবনের মানুষের উন্নতির পরিবর্তে শহরের লোভ লালসা, অর্থের বিলাসিতা যদি গভীর বাস্তুতন্ত্রে ছড়িয়ে পড়ে তবে তার নাগপাশে আবদ্ধ হয়ে মারা পড়বে সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্র। বাস্তবিকই সুন্দরবনটাই হারিয়ে যাবে।

সুন্দরবনের ইতিহাসে গভীর বাস্তুতন্ত্রের অবদানঃ

৯৬৩০ বর্গ কিলোমিটার জায়গা জুড়ে সমগ্র সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের আয়তন, ১১২টি দ্বীপের পরিবর্তে ৫৪ টি দ্বীপ জুড়ে প্রায় ৫০ লক্ষের মতো জনসংখ্যা নিয়ে সুন্দরবনের গভীর

বাস্তুতন্ত্রের অবস্থান। মোট বনভূমির পরিমান ২৩৪৭.০ বর্গ কিলোমিটার, মোট জলাভূমির পরিমান ১৯২০ বর্গ কিলোমিটার। জঙ্গল হাসিল করা আবাদি জনপথ, কৃষিক্ষেত্র ও মাছ চাষের ভেড়ি সহ ৫৩৬৩.৪ বর্গ কিলোমিটার। তাছাড়া মেরুদন্ডী, অমেরুদন্ডী, স্তন্যপায়ী, সরীসৃপ ইত্যাদি সব মিলে ১৫৪৬ প্রাণী প্রজাতির অধিষ্ঠান। এছাড়া সুন্দরী, গরান, গোলপাতা ৮৪ টি প্রজাতির ম্যানগ্রোভ সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের প্রাকৃতিক সম্পদ। বাস্তবিক অর্থে যদি বিচার বিশ্লেষণ করা যায় তবে বলা হয় সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের উদ্ভিদ, প্রাণী, পশু-পাখি, নদী-নালা, খাল-বিল সবই বাস্তুতন্ত্রের অবদান। কারণ এদেরকে নিয়েই বাস্তুতন্ত্রের ধ্বংসকারী মনুষ্য সম্পদের জীবন জীবিকা নির্ধারিত হয়। তবে বাস্তুতন্ত্রের অন্তর্গত সমস্ত কিছুর মধ্যে এক নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। কোনোকিছু একটাকে বাদ দিলেই বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যে আঘাত পড়বে। ম্যানগ্রোভ অরণ্য বাঁচিয়ে রেখেছে সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রকে। শতকরা ৬৩ ভাগ বনভূমির মধ্যে সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রকে ঘিরে রয়েছে ৬৪ টি প্রজাতির ম্যানগ্রোভ। ১০২ টি দ্বীপের ৫৪ টি দ্বীপে জনপথ তৈরি হয়েছে। যাদেরকে বেষ্টন করে রয়েছে বিচিত্র সব বৃক্ষ[১৪]। কোনোটি অর্থকরী দিক থেকে উল্লেখযোগ্য, আবার কোনোটি ভেষজ গুণে সমৃদ্ধ। সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ প্রাচীন ভেষজ বিজ্ঞানের আকর। নিম্নে কিছু ভেষজ গুণে সমৃদ্ধ গভীর বাস্তুতন্ত্রের ম্যানগ্রোভ সম্পর্কে আলোচিত হল-

১। ক্যান্ডেলিয়া ক্যান্ডেল প্রজাতির রাইজোফোৎরেসি গোত্রীয় গড়িয়া ম্যানগ্রোভ বৃক্ষ আজ অবলুপ্তির পথে। গৃহের বিভিন্ন কাজে এর ব্যবহার হয়ে থাকে। তাছাড়া গড়িয়ার বাকলের রস ট্যানিন কারখানায় বেশ উপকারী। বাকলের রস বহুমূত্র রোগের প্রতিকারের জন্য ভেষজ বিজ্ঞানীরা ব্যবহার করেন।

২। ধুঁদুল জাইলোকার্পাস গ্রানাটাম প্রজাতির ম্যানগ্রোভ। নৌকা নির্মাণ, আসবাবপত্র বানাতে ধুঁদুল ব্যবহার হয়ে থাকে। ধুঁদুলের লাল রং যেমন ট্যানিনের জন্য ব্যবহার করা হয়, তেমনই ভেষজ বিজ্ঞানীগণ উদরাময়, রক্তক্ষরণ অসুখে ধুঁদুল ব্যবহার করার জন্য উপদেশ দিয়ে থাকেন।

৩। সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রে ম্যানগ্রোভ গেঁওয়া এক্সোকারিয়া প্রজাতির বৃক্ষ সুন্দরবনবাসী জ্বালানীর কাজে ও আসবাবপত্র তৈরিতে ব্যবহার করেন। তাছাড়া গেঁওয়া দ্রুত বনসৃজন ও ভুমিক্ষয় রোধে সক্ষম।

৪। অধিক অর্থনৈতিক উপকারিতার কারণে মানুষের কুঠার ঘাতের সম্মুখীন হয় গরান। গরানের ছাল রক্তক্ষরণ রোধে, পচনশীল ঘা থেকে বাঁচার উপশম হিসাবে ভেষজ কাজে ব্যবহৃত হয়।

৫। বিজ্ঞান মহলে ফায়ার ফ্লাই ম্যানগ্রোভ নামে পরিচিত কেওড়া সোন্নারেসিয়েসি গোত্রের এক চিরহরিৎ ম্যানগ্রোভ। কেওড়ার ফুলের মধুর বেশ খ্যাতি রয়েছে। রক্তক্ষরন রোধে, কৃমির ঔষধ প্রস্তুত করতে ও ভিনিগার তৈরি করতে কেওড়া ব্যবহৃত হয়।

৬। বাইন বৃক্ষের গোলাকার ফল ও ফলের মধ্যেকার রস ফোড়া নিরাময়কারী ভেষজ গুণে সমৃদ্ধ। পেয়ারা বাইন বৃক্ষের পাতার রস গর্ভপাত বিষয়ক ও ফলের বীজ ব্যাথা বেদনার উপশমে উপকারী।

৭। হিজল ম্যানগ্রোভ ব্যারিটোনিয়া অ্যাকুট্যাংগুলা প্রজাতির বৃক্ষ। সুন্দরবনবাসীর নৌকানির্মাণ সহ হিজল বৃক্ষের বাকলের নির্যাস মাছ শিকারে ব্যবহার হয়। হিজল পাতার রস চোখের ছানির নিরাময়ে ব্যবহার করা হয়।

৮। সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের লোকালয়ে ও জনপদে সবুজায়ন ঘটাতে ডেরিস ইন্ডিকা প্রজাতির ম্যানগ্রোভ করঞ্জা উপযোগী। পতঙ্গ নাশক ঔষধ প্রস্তুত করতে এবং সর্দি-কাশিতে ব্যবহার করা করঞ্জা বীজের গুড়ো।

৯। অর্থনৈতিক ভাবে উপযোগী এবং ভেষজ গুণে অধিক সমৃদ্ধ রাইজোফোরিস গোত্রীয় কাঁকড়া ব্যবহৃত হয় কৃত্রিম অরণ্য সৃজনে। তাছাড়া ভুমিক্ষয় রোধে, পরিবেশের দূষণ রোধে, চর্মশিল্পে, কারখানার কাঁচামাল, নৌকা নির্মাণ শিল্পে, এবং পেটের উদরাময়, ডাইরিয়ার ঔষধ প্রস্তুত করতে কাঁকড়ার ছাল ও ফল ব্যবহার করা হয়।

১০। অধিক লবণযুক্ত ব-দ্বীপ অঞ্চলের আদি উদ্ভিদকুলের অন্যতম বলে পরিগণিত হয় গর্জন ম্যানগ্রোভ। রাইজোফোরা এপিকুলেটা গোত্রের গর্জন রক্তক্ষরণ, বহুমুত্র রোগ নিরাময় করতে ব্যবহৃত হয়। উল্লিখিত ম্যানগ্রোভ[১৫] এভাবেই সুন্দরবনবাসির নানান উপকারে ব্যবহৃত হয়। সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের মূল্যবান প্রাণীসম্পদ প্রাকৃতিক ভারসাম্য ও খাদ্য শৃঙ্খলা রক্ষ্যায় অপরিসীম। ১৫৮৬ প্রজাতির প্রাণী সম্পদে সমৃদ্ধ সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্র। রাজকীয় রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার দেখতে সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের পর্যটন কেন্দ্রে এসে জমা হয় পর্যটকের স্রোত, তাতে সুন্দরবনবাসি অর্থনৈতিক ভাবে সমৃদ্ধ হয়।

সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের সম্পদ ঝিনুক অর্থনৈতিক দিক থেকে যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষায়ও আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পোলটির খাদ্য এবং চুন তৈরির জন্য ঝিনুক ও সামুক সংগৃহীত হয় সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের নদী-নালা-খাল ইত্যাদি থেকে। এই পরিমানটা এতটাই যে ক্যানিং-এর মাতলা-ঠাকুরান নদীর বুকে একটা ঝিনুক বা শামুকের দেখা মেলা ভার। বিপদের আশঙ্কা থাকা সত্বেও সুন্দরবনের মানুষ, স্কুল-ছুট ছাত্র-ছাত্রিরা কুইন্টাল প্রতি ৮ টাকা মুল্যে

ঝিনুক ও শামুক উত্তোলনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ঝিনুকের মধ্যে থাকে মেরেট্রিক্স এসপি এবং অ্যানন্দ্রা এসপি আর শামুকের মধ্যে থাকে টেলিস্কপিয়াম এসপি এবং সেরিথিডিয়া এসপি যে কারণে প্রজাতি গুলির বাণিজ্যিক চাহিদা অনেক বেশি[১৬]। তাছাড়া কলকাতা শহরের বিভিন্ন স্থানের বর্জ্য পদার্থ বিভিন্ন খালের মধ্য দিয়ে বিদ্যাধরী নদীতে মেশে। কেবলমাত্র জনজীবন এলাকার নয়, পূর্ব কলকাতার বিভিন্ন কল কারখানার বর্জ্যও থাকে এর সঙ্গে। এছাড়াও বাসন্তী, সোনাখালি, ক্যানিং, পাথর প্রতিমা, কাকদ্বীপ এলাকার বর্জ্য পদার্থ ও নদীর জলে মেশে।

প্রকৃতি তার আইনে নদীর জলের এই দূষণ জৈবিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মুক্ত করার প্রচেষ্টা চালায়। কম্বোজ শ্রেণীর শামুক ও ঝিনুক ধাতব ও অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ গ্রহণ করে নদীর জলের পরিছন্নতা বজায় রাখে[১৭]। কেওড়া গাছের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ধাতুর উপস্থিতির পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ ধাতুর মধ্যেকার দূষক পদার্থ গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখে কেওড়া নামক এই লবণাম্বু উদ্ভিদ। সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের সামুদ্রিক কচ্ছপ বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বজায় রাখতে সক্ষম। সারা পৃথিবীতে পাঁচ প্রকারের কচ্ছপের মধ্যে অলিভ রিডলে, গ্রীন টার্টল, হকসবিল এই তিন প্রজাতির কচ্ছপ সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের বাগমারা, কলস, লোথিয়ান, বকখালি প্রভৃতি এলাকায় দেখা যায়। এই সামুদ্রিক কচ্ছপ পরিবেশের বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বজায় রেখে ঝাড়ুদার-এর ভুমিকা পালন করে। কাককে যেমন ঝাড়ুদার পাখি হিসেবে গণ্য করা হয় তেমনিই কচ্ছপকে ও বাস্তুতন্ত্রের ঝাড়ুদার প্রাণী বলে অভিহিত করা হয়। প্রকৃতির সব ক্ষয়প্রাপ্ত বস্তু ভক্ষন করে কচ্ছপ পুষ্টিকারক দ্রব্য মোচন করে। তাছাড়া গভীর বাস্তুতন্ত্রের জলজ সব আগাছার বৃদ্ধি নাশ করে জলজ পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়।

সুন্দরবনের বিরাট সংখ্যক মানুষ সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সম্পদকেই বেছে নিয়েছে তাদের জীবন জীবিকার মূল উৎস রূপে। সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের নদী-নালা-খাল-বিল থেকে মাছ, কাঁকড়া, চিংড়ি, মীন প্রভৃতি ধরে জীবন অতিবাহিত করে। সুন্দরবনের কাঁকড়া শিকারির সংখ্যা খুব কম নয়, প্রায় ৭০ হাজারের মতো। তাছাড়া স্ত্রী-পুরুষ জাতি নির্বিশেষে ৩০ হাজারের ও অধিক মানুষ এই পেশায় যুক্ত। সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন প্রান্তের ১৫০ টির ও বেশি গ্রামে এরা বসবাস করে। তপশিলি জাতিদের মধ্যে বাগদি, পোদ, হাঁড়ি, ডোম এবং আদিবাসীদের মধ্যে শবর, সাওতাল, মুন্ডা ইত্যাদি সব জাতির মানুষ সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রে বসবাস করে। এবং কাঁকড়া শিকারকে জীবন ধারনের অবলম্বন বলে মনে করে। সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রে প্রায় ১১ প্রজাতির কাঁকড়া বাণিজ্যিক ভাবে যুক্ত। ৫ টি প্রজাতির কাঁকড়া মনুষ্য খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাকি ৬ টি প্রজাতি ফিস-মিল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যদিও প্রায় ২ কেজি পর্যন্ত ওজন নিয়ে কাঁকড়া গভীর বাস্তুতন্ত্রে বসবাস করে। তবে গড়পড়তা ২০০ থেকে ৫০০ গ্রাম ওজনের কাঁকড়া রপ্তানির কাজে ব্যবহৃত হয়[১৮]।

এই কাঁকড়া শিকারিরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পুববাদা (পূর্ব দিকের অঞ্চল) সংলগ্ন কাকমারি, বকখালি, বুড়িরডাবরি এবং পশ্চিমবাদা (পশ্চিম দিকের অঞ্চল) সংলগ্ন কুসুমখালি, নুনমারি, হরিণঘাটা প্রভৃতি সব নদী সংলগ্ন জঙ্গল থেকে হাজারো সমস্যা মাথায় নিয়ে কাঁকড়া শিকার করে জীবন ও জীবিকা চালায়। সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রকে ঘিরে কাঁকড়ার আড়ত তৈরি হয়েছে, যদিও এই কাঁকড়ার আড়তের পরিসংখ্যান সঠিক ভাবে জানা যায় না তবুও নিম্নলিখিত সারণিতে কয়েকটি আড়তের বিবরণ তুলে দেওয়া হল, সেই আড়ত গুলোতে গ্রেডিং করা কাঁকড়া কলকাতার রাজাবাজার, শিয়ালদহ, বাঘাযতীন, বারাসাত প্রভৃতি সব রপ্তানিকৃত সংস্থা গুলির কাছে পৌছে দেওয়া হয়।

সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের যে সব জায়গায় কাঁকড়ার আড়ত আছে তার একটা পরিসংখ্যান নিচে দেওয়া হলঃ-

জায়গার নাম	আড়তের সংখ্যা	জায়গার নাম	আড়তের সংখ্যা
ন্যাজাট	১৫	সরবেড়িয়া	৫
ক্যানিং	১৭	মালঞ্চ	৩
কৈখালি	৩	নগেনাবাদ	২
দেউলবাড়ি	৫	কাঁটামারি	১
লাহিড়িপুর	৮	সত্যদাসপুর	৩
সমসেরনগর	৮		
মোট	৭০টা		

সুত্রঃ- শঙ্করকুমার প্রামানিক, সুন্দরবন জল-জঙ্গল-জীবন, পৃষ্ঠা- ১৫৬

বিশ্বের বাজারে সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রে কাঁকড়া ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমনকি দেশের বাজারেও এই কাঁকড়ার বিপুল চহিদা। কাঁকড়ার দাম ও উর্ধ্বমুখি। যে কারণে দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী মানুষদের জীবন-জীবিকার গুরুত্বপূর্ণ একটা অবলম্বন বলা যেতে পারে। ন্যাজাট বাজারের কাঁকড়ার দামের একটা তালিকা নিম্নে দেওয়া হলঃ

পুরুষ কাঁকড়া	দাম প্রতি কেজিতে
১০০-১৪৯ গ্রাম	১০০-১২০ টাকা
১৫০-২৯৯ গ্রাম	১৪০-১৫০ টাকা
৩০০-৩৯৯ গ্রাম	২৫০-২৬০ টাকা
৪০০-৪৯৯ গ্রাম	৩১০-৩২০ টাকা
৫০০ গ্রাম ও তার বেশি	৪২০-৪৩০ টাকা

মেয়ে কাঁকড়া	দাম প্রতি কেজিতে
১০০-১৪৯ গ্রাম	১৩০-১৪০ টাকা
১৫০-১৫৯ গ্রাম	১৬০-১৭০ টাকা
১৮০-২৪৯ গ্রাম	৫৮০-৬০০ টাকা
২৫০ গ্রামের ঊর্ধ্বে	৬৫০-৭০০ টাকা

সুত্রঃ- শঙ্করকুমার প্রামাণিক, সুন্দরবন জল-জঙ্গল-জীবন, পৃষ্ঠা- ১৫৬

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ফিসারিজ দপ্তরের হ্যান্ডবুকের থেকে পাওয়া পরিসংখ্যানে দেখা যায়, সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের বুক থেকে ২০০৯ এবং ২০১০ সালে প্রায় ৪০০০ টন এবং ২৯৯০

টন কাঁকড়া ধরা হয়েছে, কাঁকড়া খুবই মুল্যবান একটি প্রাকৃতিক সম্পদ।কিন্তু সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রকে ঘিরে এর সংখ্যাটা অফুরন্ত নয়। তাছাড়া কাঁকড়াই পারে গভীর বাস্তুতন্ত্রের পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে। "একই সঙ্গে সাস্থ্য বিভাগ এবং পরিচ্ছন্নতা দপ্তরের কাজ করে এই কাঁকড়ারা বাদাবনের পচা পাতা, জঞ্জাল সাফ করে ওরাই বাঁচিয়ে রাখে বনকে। ওরা না থাকলে তো নিজেদের আবর্জনার চাপেই দমবন্ধ হয়ে মারা পড়তো জঙ্গলের সব গাছ। বাদাবনের জৈবতন্ত্রের একটা বিরাট অংশই যে এই কাঁকড়ারা, সেটা কেউ অস্বীকার করতে পারবে? ডাল পাতা সমেত সমস্ত গাছের তুলনায় ও যে একটা বাদাবনে কাঁকড়াদের গুরুত্ব বেশি সেটা তো সত্যি? কেউ একজন তো বলেই ছিলেন যে ম্যানগ্রোভের বদলে এই ধরনের নদী মুখের জঙ্গল গুলির নাম কাঁকড়াদের নামেই হওয়া উচিত। কারণ বাঘ বা কুমির বা ডলফিন নয়, এই কাঁকড়ারাই হল গোটা বাদাবনের জৈবতন্ত্রের মূল ধারক[১৯]"।

কাঁকড়ার অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক মূল্য অনেক বেশি এবং একে ঘিরেই বাস্তুতন্ত্রের অংশীদারি বিভিন্ন জাতির মানুষের জীবিকা নির্ধারিত হয়। তাসত্ত্বেও কাঁকড়ার এই পর্যাপ্ততা সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্র থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে। বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য জনিত সমস্যার কারণে এই সম্পদ আজ অবলুপ্তির পথে। ০৯.০৪.২০১৯ তারিখে জি-প্লট সত্যদাস পুরের 'মা মেনকা ক্র্যাব অ্যান্ড ফিসট্রেড' নামক কাঁকড়া আড়তের মালিকের কাছ থেকে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে পাওয়া বর্তমান সময়কালে কাঁকড়ার বাজার মূল্যের নিম্নলিখিত একটা তালিকা প্রস্তুত করা হল-

মা মেনকা ক্র্যাব অ্যান্ড ফিসট্রেড–এ কাঁকড়ার দামঃ

পুরুষ কাঁকড়া	দাম প্রতি কেজিতে
১০০ গ্রাম	১৫০ টাকা
২০০ গ্রাম	৪০০ টাকা
৫০০ গ্রাম	৫০০-৬০০ টাকা

মেয়ে কাঁকড়া	দাম প্রতি কেজিতে
১০০ গ্রাম	২০০ টাকা (যদি ডিম থাকে)
২০০ গ্রাম	৫০০ টাকা (যদি ডিম থাকে)
৫০০ গ্রাম	৭০০ টাকা বা তারও বেশি

সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সুন্দরবনবাসীকে বাঁচিয়ে রেখেছে। কেবলমাত্র সুন্দরবনবাসী নয় বিশ্ববাসীর নিকট ও সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের সম্পদের বিপুল চাহিদা। বিভিন্ন প্রজাতির কাঁকড়ার মধ্যে রাজ কাঁকড়া কে জাতীয় সম্পদ হিসেবে মর্যাদা দেওয়া হয়।

বিশেষজ্ঞদের অনুমান এই রাজ কাঁকড়া প্রায় ৪০ কোটি বছর আগে পৃথিবীতে এসেছে। রাজ কাঁকড়ার নীল রক্ত দিয়ে ব্লাড ক্যান্সারের ঔষধ প্রস্তুত করা হয়। আবার ঔষধের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার তারিখ নির্ণয় করা হয় ঔষধে রাজ কাঁকড়ার নীল রক্ত মিশিয়ে। রক্তের রং সাদা হয়ে গেলে তা মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার তারিখ নির্দেশ করে[২০]। সুন্দরবনরে ১০১ টি দ্বীপকে ঘিরে অসংখ্য নদী-নালা মাছধরা জালের ফাঁসের মতো ছড়িয়ে আছে। কালিন্দী, ইচ্ছামতী, পিয়ালী, বারতলা, মৃদঙ্গভাঙ্গা ইত্যাদি সব উল্লেখযোগ্য নদী সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রকে ঘিরে রয়েছে। দীর্ঘতম নদীগুলির মধ্যে শীর্ষস্থানে রয়েছে বিদ্যাধরী। কেবলমাত্র সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের ইচ্ছামতী নদীই মিষ্টি জলের স্রোত বহন করে চলে। বাকী নদীগুলিকে ঘিরে নোনা জলের স্রোত। নদীগুলিকে ঘিরে ৫৪ টি দ্বীপে মানুষের বসবাস। এই ৫৪ টি দ্বীপের প্রায় ৫০ হাজারের মতো মানুষ নোনাজলের নদীর বুকে মীন, চিংড়ি বা ছোট মাছ ধরে জীবিকা নিয়ন্ত্রন করে। বাগদার মীন বৈশাখ মাস থেকে আষাঢ়-শ্রাবন মাস পর্যন্ত সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন নদী পাওয়া যায়। তবে জঙ্গলে বারো মাস বাগদার মীন পাওয়া যায়।

সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রকে ঘিরে চিংড়ির মাছ চাষে সুন্দরবন বিখ্যাত। সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের ৯৫৬০ হেক্টর জায়গাতে মিষ্টি জলের মাছ চাষ হয়। বছরে প্রায় ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন মাছ রপ্তানী করে প্রায় ৬০০ কোটির মতো অর্থ এখানে আসে। সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রে বছরে ১০০০-১৫০০ মেট্রিক টন কাঁকড়া উৎপন্ন হয়, বিদেশের বাজারে বিক্রি করে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়।

২০০৫ সালে ৪২৫ মেট্রিক টন কাঁকড়া বিদেশের বাজারে রপ্তানি করে ৪৭০ কোটি টাকা আসে[২১]। আগেই বলা হয়েছে যে সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের ইচ্ছামতী নদী ছাড়া বাকি নদীগুলো

নোনাজলে পরিপূর্ণ। যে কারণে লবণাম্বু ম্যানগ্রোভ সুন্দরবনকে ম্যানগ্রোভ অরণ্যভূমি হিসাবে জায়গা দিয়েছে। মোট বনভূমির আয়তন প্রায় ২৩৪৭ বর্গ কিলোমিটার। এই বিশালাকার বনভূমির কারণে সুন্দরবনের মানুষ সহ পশু পাখি ইত্যাদি সব প্রাণী সম্পদ বেঁচে আছে। সমগ্র সুন্দরবনের ৬০০০ বর্গ কিলোমিটার বনের অক্সিজেন আমাদের বায়ুমণ্ডলকে বিশুদ্ধ রেখেছে। তাছাড়া এই গভীর বাস্তুতন্ত্রের ম্যানগ্রোভের জঙ্গল ঘূর্ণিঝড়, আইলা, সিডার, জলোচ্ছ্বাস প্রমুখ প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে গভীর বাস্তুতন্ত্রের উপকূল সমুদয় রক্ষা করছে। জেলার সার্বিক নিরাপত্তা বিধান করছে। গভীর বাস্তুতন্ত্রের এই সুন্দরবন প্রাকৃতিক বেষ্টনী তৈরী করে সমুদ্রের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করে চলেছে। আবার সুন্দরবনকে রক্ষা করে চলেছে প্রাকৃতিক প্রহরী বাঘ। যদি এখানে বাঘ না থাকতো তবে বহু আগেই এই বন নিঃশেষ হয়ে যেত প্রকৃতির গর্ভ থেকে। সারা সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রকে ঘিরে যে ম্যানগ্রোভ বৃক্ষের প্রাচুর্যতা তার নির্দিষ্ট একটা ব্যবহারিক মূল্যও রয়েছে, তা কোন অংশে কম নয়। বার্ষিক ৪৬.২ কোটি মূল্যের কার্বন শোষণ করে সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের ম্যানগ্রোভ প্রকৃতি, তাছাড়া বাৎসরিক ২৭.৫ কোটি মূল্যের সাইক্লোন প্রতিহত করতে পারে। বাৎসরিক ১৬০ কোটি টাকার মৎস্য উৎপাদিত হয় এখান থেকে[২২]।

সুন্দরবনের অর্থনীতি মূলত মৌসুমি বায়ুর আশীর্বাদের ফলাফল। সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের বাদাবন যে ম্যানগ্রোভ দ্বারা আচ্ছাদিত তাতে গড়পড়তা ১৬২৫ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়। আবার কোন কোন অস্বাভাবিক বছরে এই বৃষ্টিপাতের পরিমান ২০০০ মিলিমিটার ছাড়িয়ে যায়। নিম্নে সারণিতে জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের হিসাব দেওয়া হলঃ-

মাস	গড়পড়তা	বৃষ্টিপাতমি.মি.	মাসিকবৃষ্টিপাতেরশতকরা	বৃষ্টিরদিনেরগড়পড়তাসংখ্যা
জানুয়ারী	০.২২	৫.৫৯	০.৩	০.৪৯
ফেব্রুয়ারী	০.৭৫	১৯.০৫	১.২	০.৪৫
মার্চ	১.৩৭	৩৪.৮০	২.১	১.৭৮
এপ্রিল	২.৪৮	৬৩.০০	৩.৯	১.৭৩
মে	৪.৯৭	১২৬.০০	৭.৮	৪.৯৮
জুন	১০.২৪	২৬০.১০	১৬.০	১১.৫৫
জুলাই	১৪.১২	৩৫৮.৬৫	২২.১	১৫.২৭
আগস্ট	১২.৮৪	৩২৬.১৪	২০.১	১৩.৫৫
সেপ্টেম্বর	৯.৫৮	২৪৩.৩১	১৫.০	১২.২৬
অক্টোবর	৫.১৪	১৩০.৬০	৮.০	৬.৩৮

নভেম্বর	২.০৩	৫১.৫৬	৩.২	২.০৫
ডিসেম্বর	০.২৪	৬.০৯	০.৪	০.৫০

সুত্রঃ- শচিন দাস, জল জঙ্গল ও জনজীবনে সুন্দরবন, পৃ- ১২২, ১২৩

সারণিতে যে বৃষ্টিপাতের পরিসংখ্যান দেখানো হল এর উপর ভিত্তি করেই গভীর বাস্তুতন্ত্রের পশু-পাখি-মানুষ ও ম্যানগ্রোভ একটা শৃঙ্খলাতে বিরাজ করে। যদিও বিশ্বউষ্ণায়ন এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে গভীর বাস্তুতন্ত্রকে বিরত রেখেছে। সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রকে ঘিরে মৌলেরা তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন অতিবাহিত করে। এখানকার অরণ্যজীবি মধুসংগ্রহকারী মানব সম্পদ বাস্তুতন্ত্রের বুক থেকে সাধারণত এপ্রিল থেকে মে মাস পর্যন্ত সময়ে মধু সংগ্রহ করতে যায়।

‘এপ্রিল মাস মধুমাস’ সুদূর হিমালয় থেকে মৌমাছিরা সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের আসে। এসে অরণ্যের গভীরে চাক বানায় ও মধু তৈরি করে। বাস্তুতন্ত্রের বেশ কিছু ম্যানগ্রোভ এই মধু তৈরি করতে মৌমাছিদের সাহায্য করে। ম্যানগ্রোভ থেকে পাওয়া মৌচাক গঠনে সাহায্যকারী বৃক্ষরাজির শতকরা আনুপাতিক হারের একটা পরিসংখ্যান নীচে দেওয়া হল-

বৃক্ষ	শতকরা হার
বাইন	১৬%
সুন্দরী	৯%
পশুর	২ .৮%

গর্জন	১০%
গেঁওয়া	৩৯%
কাঁকড়া	৩ .৫%
ধোন্দল	১ .৯%
গরান	১১%
কেওড়া	৫ .৩%
অন্যান্য	১ .৫%

সুত্রঃ- শচীন দাশ, জল জঙ্গল ও জনজীবন, পৃ- ৫৫

সারণিতে যে তালিকা দেওয়া হল তাতে একটা বিরাট সংখ্যক ম্যানগ্রোভ মধু পেতে ও মোম পেতে সাহায্য করে। প্রতি বছরে সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রে ৪৫০০ টির মতো নৌকা নিয়ে সুন্দরবনের মউলেরা মধু সংগ্রহ করতে যায়। বছরে গড়ে ৫০০ কুইন্টাল মধু এবং ৩০০০ কিলোগ্রাম মোম এরা সংগ্রহ করে[২৩]।

১৮৭২ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্র থেকে ৩০৩০৫০ টন cwts কাঠ রপ্তানী হত। ১৯৭১-৭২ সালের সমীক্ষায় দেখা যায়, ৪৫০০০ নৌকা নিয়ে কাঠুরেরা বাস্তুতন্ত্র থেকে কাঠ সংগ্রহ করত। বন থেকে বাৎসরিক আয় হতে ৬ লক্ষ টাকা[২৪]। সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রে পার্শে, ভাঙন, ভেটকি, বাঁশপাতা, চিংড়ি, ইলিশ, ট্যাংরা, তোপসে মিলে ১৩০ টি প্রজাতির স্বাদু ও লোনা জলের মাছ পাওয়া যায়। তাছাড়া প্রতি বছর ১২০০০ জেলে গভীর বাস্তুতন্ত্রের নদী থেকে

২০০০ টন মত মাছ সংগ্রহ করে। ১৯৪৮-৪৯ সালের সমীক্ষায় দেখা যায় প্রতিদিন গড়ে ৩০০ মন মাছ কলকাতায় আসে[২৫]। বর্তমানে এই পরিমাণটা কয়েকশ গুন বেড়েছে। আগস্ট থেকে ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত মাছ সংগ্রহের কাজ চলে। বর্তমানে সারা বছর ধরে মাছ সংগ্রহের কাজে জেলেরা নিমজ্জিত থাকো। সবচেয়ে বেশি মাছ ধরা হয় নভেম্বর, ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসে।

নিম্নে একটা মাছ ধরার পরিসংখ্যান দেখানো হলঃ

সাল	কুইন্ট্যাল
১৯৬০-৬১ তে মাছ ধরা হয়েছে	২,৫৬৬.৪৯
১৯৬১-৬২ তে মাছ ধরা হয়েছে	৩২,৪৩৪. ১১
১৯৬২-৬৩ তে মাছ ধরা হয়েছে	৩০,০২৩.২৯

সুত্রঃ- রঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ও ইন্দ্র কুমার মিস্ত্রী, সুন্দরবনের অর্থনীতি জনসংস্কৃতি ও পরিবেশ, পৃ. ৬৫

১৯৬০-৬৩ পর্যন্ত সময় কালে মাছ ধরার যে হিসেব দেখানো হল এর থেকে আরো বেশি সংখ্যক মাছ বর্তমানে সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্র থেকে সংগ্রহ করা হয়। বর্তমানে সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রকে ঘিরে নানান ধরনের শিল্পের অবস্থান চোখে পড়ে। পাট শিল্প, কাগজ শিল্প, মৎস্য শিল্প থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের শিল্পে বাস্তুতন্ত্রের মানুষের জীবন-জীবিকা নির্ধারিত হচ্ছে।

নিম্নে একটা পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলঃ-

শিল্প	শতকরা লোক নিযুক্ত

চাল কল	২২.৫৬%
তৈল কল	৩.৫৭%
বরফ শিল্প	২.৪৪%
নৌকা শিল্প	৬.৯৮%
মধু শিল্প	১.৭৯%
লাঙল শিল্প	০.৯৭%
লবণ শিল্প	০.৮১%
গরুর গাড়ির চাকা	০.৬৫%
তাঁত শিল্প	৪.৩৮%
দেশালাই শিল্প	২.৪৪%
প্যাকিং বাক্স	১.৬৩%
মৎস্য শিল্প	১৮.১৮%
মাদুর শিল্প	২.১১%
কাঠ শিল্প	৩.৫৭%

গম ভাঙানো	১.৯৫%
কাগজ শিল্প	৫.৫২%
পাঠ শিল্প	৪.৩৬%
তুলা শিল্প	৭.১৪%

কুটির শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মানুষের যে সারণিটি[২৬] এখানে দেওয়া হল তাতে বোঝা যায় যে সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের নানান শিল্পই এদের স্বাভাবিক জীবন চালাতে সাহায্য করে। গভীর বাস্তুতন্ত্র যে কেবলমাত্র অবদান হিসাবে আমাদের কাছে ধরা দেয় তা কিন্তু নয়, বঙ্গোপসাগরের কোলে সৈনিকের মত দাঁড়িয়ে থেকে সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের ম্যানগ্রোভ আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। অনেকটা সেই বর্ডারে সৈনিক দাঁড়িয়ে থাকার মত।

সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্র কেন্দ্রিক বিভিন্ন ধরনের সমস্যার পর্যালোচনাঃ

সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের সমস্যা বিপুল। দিনের পর দিন তা যে কমছে তা কিন্তু নয়। ৫০ লক্ষ মানুষের বাস এই বাস্তুতন্ত্রে। তাই সমস্যা গুলি পর পর এগিয়ে চলেছে, কোনটি জটিল, কোনটি জটিলতর আবার কোনো সমস্যা জটিলতম।

প্রতিকার করার জায়গা গুলি কিছুটা হয়তো সহজ আর অধিকাংশ সমস্যাই সমাধানের পথে অন্তরায়, বড়ই কণ্টকাকীর্ণ। এখানকার বাস্তুতন্ত্রকে আরামদায়ক ও স্বস্তিকর করার বাসনায় সরকারী বেসরকারী সমস্ত স্তরেই দেখা যায় নানান সব প্রচেষ্টা। কিন্তু সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্র তার সম্পদ

হারিয়ে যে ভারসাম্য ক্ষোয়াতে বসেছে তা বোধ হয় এক নিমেষে সমাধানের পথে যাওয়া সম্ভব নয়। তবুও গভীর বাস্তুতন্ত্রকে ঘিরে যে সমস্যার পর্যালোচনার চেষ্টা করছি তাতে একপ্রস্থ প্রতিকারের ব্যাপারটাও তুলে ধরার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হলাম। বিপুল সম্ভাবনাময় সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্র আজ অবহেলিত ও সঙ্কটাপন্ন, নানান সমস্যায় জর্জরিত। সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রকে ঘিরে যে সমস্যা তা সাধারণত প্রাকৃতিক ও আর্থসামাজিক। আবার এই সমস্যা দুটিকে নিয়েই রচিত সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্র। ম্যানগ্রোভ অরণ্য ধ্বংস, বাস্তুতন্ত্রের বন্যপ্রাণীর বিলুপ্তি, পরিবেশগত ভারসাম্যের বিনাশ, সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের সংখ্যা হ্রাস, বিরল প্রজাতির গাছ ও পশুপাখি হত্যা, উষ্ণায়ন বৃদ্ধি, নদী বাঁধের ভাঙন, বৃষ্টিপাতের সংকটজনিত সমস্যা, জলাভূমির বিলুপ্তি, জনবসতির দ্রুত বিস্তার ও ভূগর্ভস্থ জলস্তরের হ্রাস প্রাপ্তি প্রভৃতি সব প্রাকৃতিক সমস্যা এবং সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের অধিবাসীদের জীবিকার সমস্যা, কৃসি-শিল্প-শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা, সড়ক-নদী-রেলপথে যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা, বিদ্যুৎজনিত সমস্যা, জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন ও চিকিৎসা জনিত সমস্যা, বিকল্প কর্মসংস্থানের সমস্যা, জলদস্যু-চোরা শিকারি-সীমান্তে অনুপ্রবেশ জনিত সমস্যা, মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার সমস্যা প্রভৃতি সব আর্থ-সামাজিক সমস্যায় সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্র আজ বিপন্ন[২৭]।

সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রকে ঘিরে যে লবনাম্বু উদ্ভিদের বিস্তার, তাকেই সাধারণত ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল বলে অভিহিত করা হয়। গভীর বাস্তুতন্ত্রের এই বনাঞ্চল আজ অস্তিত্ব রক্ষার সঙ্কটে ভূগছে। নদী বাঁধের ভাঙন, মনুষ্য বসতির দ্রুত সম্প্রসারণ আজ সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের ম্যানগ্রোভ অরণ্য সম্পদের ওপর অভাবনীয় ধ্বংসের প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছে। বিগত ৩০ বছরে ৭৫ শতাংশ বনভূমি ধ্বংস হয়ে গেছে। এপার-ওপার সুন্দরবনের, সুন্দরবন আধিকারিকগণ সুন্দরবনের গভীর

বাস্তুতন্ত্রের উপগ্রহ চিত্র বিশ্লেষণ করে দেখেছেন শতকরা ৭৬ ভাগ সুন্দরীগাছ, শতকরা ৮০ ভাগ গেঁয়ো গাছ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। ১০ বছরে সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্র থেকে ম্যানগ্রোভ ধ্বংসের পরিমান নিম্নে তালিকাতে দেওয়া হলঃ

সাগরদ্বীপ	১০,০০০ বর্গ কিমি
ছোট মোল্লাখালি	১,০০০ বর্গ কিমি
বাসন্তী	১০,০০০ বর্গ কিমি
ক্যানিং	২,০০০ বর্গ কিমি

সুত্রঃ- নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল, সুন্দরবনঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা- ১, পৃ- ২৩৫

এই যে অরণ্য ধ্বংসের প্রক্রিয়া চলছে তাতে আগামী দিনে সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের অরণ্য সম্পদকে আর দেখা যাবে কিনা সন্দেহ, যদি এখন সচেতন না হই।

সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রকে ঘিরে যে প্রাণী সম্পদ তাতে আজ ভাটার প্রভাব পড়েছে। মানব সমাজ পশুপ্রবৃত্তি ধারণ করে বাঘ, হরিণ, কচ্ছপ, শুকর, ইত্যাদি সব প্রাণীদেরকে বিষ, বন্দুক, ফাঁস প্রভৃতি সহযোগে মেরে চোরাই পথে বহু উচ্চমূল্যে চামড়া, মাংস, হাড় বিক্রয় করছে। এখানকার জলে ২০০ প্রজাতির মাছ দেখতে পাওয়া যেত, বর্তমানে তা ৯৩ প্রজাতির মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রকৃতির সম্পদ অফুরন্ত নয়, ঝিনুক, শামুক, কচ্ছপ, কুমির যে ভাবে পৃথিবীর বুকের থেকে তুলে নেওয়া হচ্ছে, তাতে পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে। এরা কোনো না কোনো ভাবেই পরিবেশের বর্জ্য পদার্থকে নিঃশেষ করেই বাস্তুতন্ত্রের উপকার সাধন করছে। কিন্তু মানুষের লোভ-লালসায় আজ

তারা বিলুপ্তির পথে। এখনই এর সচেতনতার প্রয়োজন। সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রকে ঘিরে ৩৫০০ কিলোমিটার একটা প্রাচীর তথা নদীবাঁধ সুন্দরবনকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। কিন্তু তা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ সম্প্রতি পরিবেশবিদদের রিপোর্টে পাওয়া তথ্যানুযায়ী বিশ্ব-উষ্ণায়নের প্রভাবে জলস্তর বাড়তে শুরু করেছে। পাঁচ বছরে সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্র লাগোয়া জলস্তর ১৭.৯ মিমি এর মতো বেড়েছে। ২০০০ সালের আগে বছরে এই বৃদ্ধির হার ছিল ৩.১৪ মিমি। ফলে নদীর নোনাজল নদীবাঁধ পেরিয়ে প্লাবিত করছে সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের বিস্তীর্ণ এলাকা। এর সাথে যুক্ত হচ্ছে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, যেকারণে অধিক ভাঙনে নদীবাঁধ গুলির ধারণ ক্ষমতা কমে যাচ্ছে, বাদাবন প্রতিনিয়ত ধ্বংস হচ্ছে।

নোনাজলে চাষবাস বন্ধ হচ্ছে, হরিণ, শুয়োরের মতো তৃণভোজী প্রাণীরা খাদ্যের সন্ধান করতে পারছেনা। এমনই চলতে থাকলে আগামী ৪০ বছরে বাঘও গভীর বাস্তুতন্ত্র থেকে হারিয়ে যাবে। অস্বীকার করার কোনো জায়গা নেই যে, সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রে মানুষের উপস্থিতি আছে বলে ডীপ ইকোলজি নিয়ে ভাবনা চিন্তা বেড়েছে। যদি মানব সমাজ না থাকতো তবে ডীপ ইকোলজি-র পর্যালোচনা অপ্রাসঙ্গীক হয়ে যেত। তাই সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রে মানব সমাজের আর্থ-সামাজিক জীবনও বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বিঘ্নিত করেছে।

সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রকে ঘিরে যে জনবিস্ফোরণ ঘটে চলেছে, তাতে বিভিন্ন সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এখানকার মানুষদের জীবন-জীবিকা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আর্থ-সামাজিক অনুন্নয়ের ধারা অনেককালের। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রন সংক্রান্ত কর্মসূচী সঠিকভাবে এখানে কার্যকরী করা যাচ্ছে না। অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও নিরক্ষরতা গঠন মূলক কর্মসূচীর পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে জনসংখ্যার চাপ সমস্ত দিককে বাধার সৃষ্টি করেছে। এত জনসংখ্যার কারণে মানুষের জীবিকার

বিকল্প কোন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না। না থাকা ও না পাওয়ার পাহাড় প্রমাণ সমস্যা এখানকার মানুষদেরকে জীবনঘাতী পেশা গ্রহণ করতে বাধ্য করছে। সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রে বসবাসকারী অধিকাংশ মানুষই কৃষিজীবী, জলজীবি, জঙ্গলজীবি ও শ্রমজীবি। ৮০-৯০ শতাংশ মানুষ কৃষিকর্মের ওপর নির্ভরশীল। আবার ৪০ শতাংশ মানুষ ভূমিহীন কৃষক। কিন্তু বিগত বছর গুলোর দিকে তাকালে দেখা যায় এখানে কৃষিকাজ বন্ধ হতে বসেছে। কারণ মৌসুমি বৃষ্টিপাতের দিকে তাকিয়ে কৃষকরা বসে থাকে, সেই বৃষ্টিপাত আজ অনিয়মিত।

প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রতিনিয়ত সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রকে ঘিরে থাকা নদী বাঁধের ওপর আঘাত হানছে। ফলে নোনাজলে প্লাবিত হচ্ছে বিস্তীর্ণ অঞ্চল। বন্ধ হচ্ছে চাষবাস, যদিও বা অগভীর নলকূপ বসিয়ে মাটির নীচের জল তুলে চাষবাস করার চেষ্টা চলছে। কিন্তু সমস্যা হল এই অগভীর নলকূপের জল আজ নিঃশেষের পথে। বাধ্য হয়ে মানুষ মাছ ধরা, কাঁকড়া ধরা, অরণ্যের গভীরে প্রবেশ করে মোম-মধু সংগ্রহ, কাঠ কাটার মতো বিপদ-সংকুল কাজে লিপ্ত।

কলকাতার কাছাকাছি অবস্থান হওয়া সত্ত্বেও নানান প্রতিকূলতা সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের উন্নয়ন আজ স্তব্ধ। বিভিন্ন প্রচেষ্টার দ্বারা সুন্দরবনের দ্বীপগুলিকে একত্রিত করার চেষ্টা চলছে। কিন্তু সেখানে অসাধুতা ও অভ্যন্তরীণ গোলযোগ এত প্রবল আকার নিয়েছে যে সরকারি অর্থের সঠিক প্রয়োগ হচ্ছে না। বর্তমান সময়কালে সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের বেশ কিছু দ্বীপে বিদ্যুতের আলো পৌঁছে গেছে ঠিকই কিন্তু যাতায়াতের জন্য সেই খেয়ার উপর নির্ভর করতে হয়। একটা দ্বীপ থেকে আর একটা দ্বীপের মধ্যেকার নদীগুলির দৈর্ঘ্য এতটা বেশি যে বিকল্প কোন চিন্তা এখানে কাজ করে না। যেকারণে অভ্যন্তরীণ মানুষের যেমন সমস্যা বেড়েছে, একইভাবে পর্যটকদের ও সুন্দরবন মুখী হতে বাধা দিচ্ছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রতিকূলতার কারণে শিক্ষা-স্বাস্থ্য ইত্যাদি সব ব্যবস্থা ভেঙে

পড়েছে। সাপে কামড়ালে, বাঘে-কুমীরে ধরলে, কিংবা অসুস্থত হয়ে পড়লে শহরের পথে পাড়ি দিতেই মাছ পথে বহু প্রাণ হারিয়ে যায়। কোথাও ব্লক পিছু একটা, কোথাও বা ২/৩ টি ব্লক নিয়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে[২৮] এর মধ্যে দুর্নীতি এতই বেশি যে সঠিক পরিষেবা থেকে এখানকার মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে।

আর এক সমস্যায় সুন্দরবনবাসী ও সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্র তার স্বাভাবিক অবস্থা হারাচ্ছে। প্রথমত উদ্বাস্তু হয়ে সুন্দরবনের মানুষ এই গভীর বাস্তুতন্ত্রে জঙ্গল সংস্কার করে বসবাসের জায়গা তৈরি করেছে। এবং নিজেদের জীবন জীবিকার জন্য এখানকার সম্পদকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে সময় অতিবাহিত করছে। তাতে গভীর বাস্তুতন্ত্রে সঞ্চিত প্রাকৃতিক সম্পদের ভারসাম্য হালকা হতে শুরু করেছে। দ্বিতীয় যে সমস্যা সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রকে বিঘ্নিত করছে তা হল যে, গাঙ্গেয় বঙ্গোপসাগরের কোলে যে সুন্দরবন একটা বাস্তুতন্ত্র রচনা করে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে, সেখানে আজ জলদস্যুদের আক্রমণ জনিত সমস্যা প্রবল আকার ধারণ করেছে। দুই ২৪ পরগনার জলসীমা দিয়ে এরা প্রবেশ করছে সুন্দরবনে। জঙ্গি ও সন্ত্রাসমূলক কাজকর্মে এরা নিয়োজিত হচ্ছে। সঠিক পরিচয় পত্র তৈরি করে এখানকার মানুষের মূল স্রোতে মিশে সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সম্পদকে চোরাকারবারির পথে বিদেশে পাচার করছে। এদের সাথে হাত মিলিয়েছে সুন্দরবনবাসী। এছাড়া সুন্দরবনের নদী-খাড়ির পথ ধরে মোটর লঞ্চ, ভটভটি, ট্রলার ইত্যাদির নিত্য যাতায়াত। তাতে এদের থেকে দূষিত তেল বেরিয়ে মিশছে নদীর জলে। তাছাড়া এর সাথে যুক্ত হচ্ছে কলকারখানার আবর্জনা। ফলে জলদূষণের কবলে সুন্দরবন। বাদ নেই বায়ুদূষণ ও শব্দদূষণ থেকেও। ফলত আজ সুন্দরবন বিপন্ন, ভারসাম্য হারাছে ম্যানগ্রোভ, সমস্যায় জর্জরিত গভীর বাস্তুতন্ত্র, অস্তিত্বের সংকটে মানব সমাজ।

তথ্যসুত্রঃ-

১। পূর্ণেন্দু ঘোষ, ইতিহাসের আলোকে সুন্দরবন ও পোর্ট ক্যানিং, লোকসখা প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, ২৫ জানুয়ারী, ২০১৭, পৃ ৫৪, প্রকাশক, মৃত্যুঞ্জয় সেন

২। সুকুমার সিং, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ইতিহাস(একখণ্ডে), মাস এন্টারটেনমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ, ২৫ অক্টোবর, ১৯৯৫, পৃ ৭২৩, ৭২৫

৩। তদেব, পৃ ৭২৫

৪। তদেব, পৃ ৭২৫

৫। রাজিব আহমেদ সম্পাদিত, সুন্দরবনের ইতিহাস, প্রথমখণ্ড, গতিধারা প্রকাশন, প্রথম প্রকাশন, ফেব্রুয়ারী, ২০১২, প্রকাশক, সিকদার আবুল বাশার, পৃ ৪৩৮

৬। নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল, সুন্দরবনঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা ১, সমকালের জিয়নকাঠি, পৃ-১৭১

৭। পূর্ণেন্দু ঘোষ, ইতিহাসের আলোকে সুন্দরবন ও পোর্ট ক্যানিং, লোকসখা প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, ২৫ জানুয়ারী ২০১৭, পৃ ৫৬, ৫৭, ৫৮

৮। বিশ্বজিৎ রায় চৌধুরী, সুন্দরবন, নান্দনিক, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী ২০১৬, পৃ-২৬

৯। পূর্ণেন্দু ঘোষ, ইতিহাসের আলোকে সুন্দরবন ও পোর্ট ক্যানিং, লোকসখা প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, ২৫ জানুয়ারী ২০১৭, পৃ ৫৬

১০। কমল চৌধুরী, দক্ষিণ ২৪ পরগানা, উত্তর দক্ষিণ সুন্দরবন, দে'জ, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৯, পৃ- ৩২২

১১। নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতি পত্র, উনবিংশ সংখ্যা, জানুয়ারী ২০১৭, পৃ- ৪৪, ৪৫

১২। সংবাদ প্রতিদিন, ২০১২, ২০ ডিসেম্বর, পৃ- ১৪

১৩। দেবপ্রসাদ জানা, শ্রীখণ্ড সুন্দরবন, দীপ প্রকাশন, পৃ-৪৪৯

১৪। সুকুমার সিং, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ইতিহাস(একখণ্ডে), মাস এন্টারটেনমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ, ২৫ অক্টোবর, ১৯৯৫, পৃ-১০১৬

১৫। সুভাষ মিস্ত্রী, লোকায়ত সুন্দরবন, লোক, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১৩, পৃ-৯০, ৯১, ৯২

১৬। সুকুমার সিং, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ইতিহাস(একখণ্ডে), মাস এন্টারটেনমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ, ২৫ অক্টোবর, ১৯৯৫, পৃ- ৮৮৫

১৭। তদেব, ৮৫৫

১৮। শঙ্কর কুমার প্রামাণিক, সুন্দরবন জল জঙ্গল জীবন, সাহিত্য প্রকাশ, প্রথম প্রকাশ, ১৪ই এপ্রিল, ২০০৮, পৃ- ১৪৬

১৯। অমিতাভ ঘোষ, ভাটির দেশ, আনন্দ, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০০৯, চতুর্থ মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১৬, পৃ- ১২৫

২০। কানাইলাল সরকার, সুন্দরবনের ইতিহাস, পাণ্ডুলিপি, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা ২০১৭, পৃ-১০৮

২১। নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল, সুন্দরবনঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা ১, সমকালের জিয়নকাঠি, পৃ-১২৬

২২। শচীন দাশ,জল জঙ্গল ও জনজীবনে সুন্দরবন, দীপ প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ১৯৯৭, পৃ-৫৫

২৩। রঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ও ইন্দ্র কুমার মিস্ত্রী, সুন্দরবনের অর্থনীতি ও জনসংস্কৃতি, প্রথম প্রকাশ, ২৩ জানুয়ারী ২০০৭, পৃ- ৬২

২৪। তদেব, পৃ- ৬১

২৫। তদেব, পৃ- ৬৪

২৬। তদেব, পৃ-৭৭

২৭। সুকুমার সিং, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ইতিহাস(একখণ্ডে), মাস এন্টারটেনমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ, ২৫ অক্টোবর, ১৯৯৫, পৃ- ৯৭৫

২৮। অনুকূল মণ্ডল, সুন্দরবনের ইতিহ্য ও সংস্কৃতি, দি সি বুক এজেন্সি, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ২০১৪

২৯। সাক্ষাৎকার, স্বপন দাস (মৎস্যজীবী, সিতারামপুর, জি-প্লট), তারিখ-১২-০৩-১৯, সময়- ১টা ৩০মিনিট।

৩০। সাক্ষাৎকার, হরিপদ গায়েন (মৎস্যজীবী, নামখানা), তারিখ- ১৯-০৩-১৯, সময়- ২টো ৪০ মিনিট।

উপসংহার

সুন্দরবন তথা সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্র আজ তার স্বাভাবিক ভারসাম্যটা হারিয়েছে। হাজারো সমস্যাই সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রকে সেই পথে চালিত করেছে। অপার সৌন্দর্য আর ভয়ঙ্করতায় পরিপূর্ণ হয়ে সুন্দরবনের যে গভীর বাস্তুতন্ত্র একটা সময় নিজেকে সজ্জিত করেছিল, তা সময়ের হাত ধরে ধীরে ধীরে ভারসাম্য হারিয়ে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে। কারণ, কেবলমাত্র জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধিই যে একমাত্র কারণ তা কিন্তু নয়। জনবিস্ফোরণকে কেন্দ্র করেই নানাবিধ সমস্যা এই পথে, অর্থাৎ সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। নির্দিষ্ট একটা শৃঙ্খলা নিয়েই কিন্তু সুন্দরবন তার স্বাভাবিক অবস্থাতেই ছিল। ক্লড রাসেলের হাত ধরেই সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রে মানুষের আগমন, আর সেই মানুষের হাতে পড়ে মানুষের সমস্যাই সুন্দরবনের স্বাভাবিক বাস্তুতন্ত্র কেন্দ্রিক ভারসাম্যকে বিঘ্নিত করল। জঙ্গল হাসিলকে কেন্দ্র করে সুন্দরবনের আবাদ ভূমির সম্প্রসারণ ঘটেছে, আর তার কারণে কোল, ভীল, সাঁওতাল, ভুমিজ, ওঁরাও, প্রভৃতি সব আদিবাসী রাঁচি, ছোটনাগপুর থেকে এসে জীবন শুরু করল সুন্দরবনের গভীর বাস্তিতন্ত্রে। তাছাড়া, বাংলাদেশের নানা জায়গা থেকে এলো- নমশূদ্র, কায়স্থ, পৌণ্ড্র এবং মেদিনীপুর থেকে এলো-মাহিষ্য, কায়স্থ ও তপশিল জাতির মানুষ-জন। জমায়েত হল সুন্দরবনে, বাধার সম্মুখীন হল সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্র। এভাবেই সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্র পরিপূর্ণতা লাভ করল জনস্রোতে। প্রাকৃতিক ও আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিই সুন্দরবনের স্বাভাবিক অবস্থাটাই পাল্টে দিয়েছে। ভারসাম্য হারাচ্ছে গভীর বাস্তুতন্ত্র। যদিও মানুষের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনই বাস্তুতন্ত্রের প্রাকৃতিক পরিবেশকে ধ্বংসের সম্মুখে দাঁড়

করিয়েছে। সুতরং এ কথা অস্বীকার করার কোন জায়গাই নেই যে, নানান সমস্যার মূল কাণ্ডারি হল সুন্দবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের মানব সম্পদ।

বর্তমানে ৫০ লক্ষ মানুষের বাস সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রে। এবং সেই গভীর বাস্তুতন্ত্রকে ঘিরে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে গড়ে উঠেছে বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বৃক্ষের বনভূমি। এই বনভূমি কেন্দ্রিক অরণ্যে দেখা যায় সুন্দরী বৃক্ষের সমাহার, আর যাকে কেন্দ্র করেই এই ভয়ঙ্কর বনভূমি বিশ্ববাসীর নিকট সুন্দরবন নামে পরিচিতি লাভ করেছে। নানান সব প্রজাতির বৃক্ষের, প্রাণীর, সরিসৃপের অবস্থান পরিলক্ষিত হয় এখানে। এবং অযাচিত ভাবেই সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রে প্রবেশ করে মানুষ। তাই সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্র আজ পরিপূর্ণতা লাভ করেছে উদ্ভিদ, প্রাণী ও মনুষ্য সম্পদে।

প্রায় ৮৬ টি প্রজাতির ম্যানগ্রোভ বৃক্ষের অবস্থান পরিলক্ষিত হয় সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রে। উল্লেখযোগ্য কিছু ম্যানগ্রোভ যেমন, সুন্দরী, গরান, কেওড়া, গর্জন, পশুর, গোলপাতা, হেঁতাল, ধুঁদুল তাছাড়া প্রাণী বৈচিত্র্যেও সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্র প্রশংসার দাবি রাখে। বিশ্ববিখ্যাত রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার সুন্দরবনের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। চিতল হরিণ, বন্য শুয়োর, বিভিন্ন প্রজাতির বানর, হাঙ্গর, কুমীর, দৈত্য বক, ময়াল, শঙ্খচূড়, কেউটে, বাংলার গোসাপ, সমুদ্রের রিডলে কচ্ছপ, বিভিন্ন প্রজাতির মৌমাছি সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রকে অনন্যতা দান করেছে। এছাড়া ১২০টি প্রজাতির মাছ নিয়ে সর্বমোট ১৫৮৬টি প্রজাতির প্রাণী সম্পদ দেখা যায় সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রে। এবং প্রতিটি সম্পদই অর্থাৎ উদ্ভিদ, প্রাণী, ও মনুষ্য সম্পদ প্রত্যেকেই একে অন্যের সঙ্গে আন্তঃসম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ। সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রকে ঘিরে যে ম্যানগ্রোভ বৃক্ষের সমাহার দেখা যায়, তাতে বাস্তুতন্ত্রের প্রতিটি বৃক্ষই অর্থকরী ও ঔষধি গুণে সমৃদ্ধ। গর্জন গাছের বাকলে ৩৩% ট্যানিন পাওয়া যায়, যা বহুমুত্র রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়। একইভাবে কাঁকড়া গাছের বাকলে পাওয়া ট্যানিনকে

পেটের অসুখ ও বহুমুত্র রোগের উপশমে ব্যবহার করা হয়। গরান এর বাকলে পাওয়া ক্বাথ, রক্ত ক্ষরণ রোধে ও ক্যানসারের রোগে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া ফণী'র ফল থেকে শ্বাসনালী থেকে কফ বের করার ঔষধ প্রস্তুত হয়ে থাকে। তাছাড়া সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের পরিণত বৃক্ষের কাঠ নানান কাজে সুন্দরবনবাসির উপকার সাধন করে। তক্তার জন্য কেওড়া ও পশুর ব্যবহার হয় বেশি। লেদের কাজের জন্য ধুঁদুল এর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। গর্জনের কাঠ থেকে ভাল কাঠকয়লা পাওয়া যায় এবং সুন্দরী বৃক্ষ থেকে পাওয়া কাঠ থেকে নৌকা তৈরি হয়ে থাকে। সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রকে ঘিরে যে অরণের বিশালতা রয়েছে, সেই বিশালাকার অরণ্য ৫০ লক্ষ মানুষের তথা সুন্দরবনের প্রাণীকূলের বেঁচে থাকার জন্য প্রাণবায়ু সরবরাহ করে। আসলে সুন্দবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্পদই মনুষ্য সমাজকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

তাসত্বেও সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রে এদের অবস্থান নিয়ে নানান সব প্রশ্ন উপস্থাপিত হয়েছে। জনবিস্ফোরণের হাত ধরে যে ভাবে সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রে মনুষ্য সম্পদের বিস্তার ঘটছে তাতে অরণ্যের স্বাভাবিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে। লালসার কুঠার, সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের বুকের থেকে প্রাকৃতিক সম্পদকে ধ্বংস করছে। প্রতিনিয়ত ম্যানগ্রোভ অরণ্য হারিয়ে যাচ্ছে সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্র থেকে। যে সুন্দরী বৃক্ষকে নিয়ে গভীর বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বজায় ছিল সেই সুন্দরী বৃক্ষ আজ অবলুপ্তির পথে। তাছাড়া গোলপাতা, টগরীবানী, গড়িয়া, লতাসুন্দরী, ওড়া, কাউফল, গর্জন, আমুর, গেওয়া, ইত্যাদি সব ম্যানগ্রোভ বৃক্ষও আজ বিলুপ্তির পথে। সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রে প্রবেশ করলে দেখা যাবে অরণ্যের মধ্যাঞ্চল কচ্ছপের পিঠের মতো বৃক্ষশুন্যতা। কেবলমাত্র মানুষের হাতেই যে এই ভয়ঙ্করতা সৃষ্ট হয়েছে এটাও যেমন ঠিক, একইভাবে 'দ্য গ্রিন' –এর জৈব খামার প্রকল্পের প্রভাবে বা প্রাকৃতিক আবহাওয়ার অবনমনে সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের ম্যানগ্রোভ বৃক্ষাদি অজানা

পোকার আক্রমণে আজ বিপন্ন। ৩৫০০ কিলোমিটার নদীবাঁধ সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রেখেছে সমুদ্রের গ্রাস থেকে, কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ সেই কাজে বাধার সৃষ্টি করছে। সব মিলিয়ে উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্পদ আজ গভীর বাস্তুতন্ত্র থেকে অবলুপ্তির পথে পা রেখেছে। অবলুপ্তির আশঙ্কায় রয়েছে প্যাঁচা, গাঙচিল, মদনঢাক, বাঘাবক, এমনকি রাজকীয় বাঘও। এসবের কারণ যে কেবলমাত্র নদীবাঁধ ভেঙ্গে যাওয়া, বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ তা কিন্তু নয়। মনুষ্য বসতির বিস্তারের কারণেও যেমন জঙ্গল সম্প্রসারণ করা হয়েছে, তেমনই ভাবে ভারতীয় অরণ্য আইনও এই অরণ্য ধ্বংসের পেছনে কাজ করে ছিল। ব্রিটিশ কলোনাইজাররা কিন্তু ভারতীয় সম্পদ গ্রাস করতেই অরণ্য আইন কার্যকরী করেছিল। সেই অর্থেই অরণ্য ধ্বংসের কাজ পরিচালিত হয়েছিল।

যেহেতু সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রকে ঘিরে মানুষের জীবন-জীবিকা পরিচালিত হত সেই অর্থেই সুন্দরবনবাসি ও গভীর বাস্তুতন্ত্রের মধ্যেকার একটা সম্পর্ক অবশ্যই আছে। কারণ প্রকৃতি তার আইনে যে বাস্তুতন্ত্র রচনা করেছে সেখানে অযাচিত ভাবেই মানুষের আগমন ঘটেছে, আর সে কারণেই সুন্দরবনবাসির সমস্যাই সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যকে নানা ভাবে ধ্বংস করে চলেছে। তাসত্ত্বেও বিপন্ন বাস্তিতন্ত্র আজ সুন্দরবনবাসির বেঁচে থাকার খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান সরবরাহ করে চলেছে। ৩৫০০ কিলোমিটার বিচ্ছিন্ন নদীবাঁধ প্রতিটি ব-দ্বীপকে নদী-সমুদ্রের গ্রাস থেকে রক্ষা করছে। গভীর বাস্তুতন্ত্রের নদীই এখানকার মানুষের জীবন ধারনের অবলম্বন। নদীর মাছ, কাঁকড়া, মীন ধরে পেটের ভাত যোগাড় করতে হয় এখানকার মানুষদের। সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রে বসবাসকারী অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করে। তাই জীবিকার প্রয়োজনে নদী ভরসা। সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের ৫ লক্ষের অধিক মানুষ মৎস্য শিকারের সঙ্গে যুক্ত। বাস্তুতন্ত্রের উদ্ভিদ সম্পদও তাঁদের প্রয়োজন মেটায়। অরণ্যের কাঠ, মধু ও মোম সংগ্রহ করে অরণ্যজীবি মানুষ

অর্থনৈতিক দিক থেকেও সমৃদ্ধ হচ্ছে। তাছাড়া বাদাবনের মধ্যেকার চিংড়ি চাষ, কাঁকড়া চাষও এখানকার মানুষের আর্থিক সমস্যা মেটায়। যেহেতু সুন্দরবন ব-দ্বীপ এলাকা এবং নদীই প্রতিটি ব-দ্বীপকে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত করেছে, সেহেতু কোন একক সরকারি পদক্ষেপের দ্বারা সমগ্র সুন্দরবনের উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না। ৩৫০০ কিলোমিটার নদীবাঁধ রক্ষা করতে গিয়ে উন্নয়ন প্রচেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে। কারণ নদীবাঁধ ঠিক থাকলে তবেই সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের উন্নয়ন সফলতা লাভ করবে। সুন্দরবনের উন্নয়নে কেবলমাত্র রাজ্য বা কেন্দ্র সরকার নয়, সুন্দবনের বাধা-প্রতিবন্ধকতা দূর করতে বেশ কিছু এনজিও ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছে।

সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রকে ঘিরে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন সব পর্যটন পরিবেশ, যার সুনাম বিশ্বের প্রতিটি কোণায় পৌঁচে গেছে। লোথিয়ান দ্বীপ, হ্যালিডে ডীপ, দোঁবাকি, নেতিধপানি, বকখালি, গঙ্গাসাগর, সজনেখালি, ঝড়খালি, প্রভৃতি সব সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্র কেন্দ্রিক পর্যটন কেন্দ্রর প্রাকৃতিক সুন্দরতা একদিকে যেমন পর্যটকদের আনন্দের রসদ যোগায়, অন্যদিকে সুন্দরবনবাসিদেরকে অর্থনৈতিক ভাবে সমৃদ্ধও করে। পর্যটন কিন্তু সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের স্বাভাবিক পরিবেশকে কলুষিত করছে, তাই আধুনিক ইকো-পর্যটন ভাবনা এনে সরকার সুন্দরবন কেন্দ্রিক পর্যটন ব্যবস্থাকে ও পর্যটন পরিবেশকে সুস্থ রাখার ব্যবস্থা করছে। তা সত্ত্বেও অজান্তেই যেন গভীর বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে। আগেই আলোচিত হয়েছে যে, সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রকে ঘিরেই সুন্দরবনবাসির সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন নির্ধারিত ও পরিচালিত হয়। নদী-অরণ্যকে ঘিরেই এখানকার মানুষ জীবন-জীবিকার সন্ধান করে, বেঁচে থাকে, স্বাভাবিক ভাবে জীবন-যাপনের সন্ধানে রত হয়। অধিকাংশ সুন্দরবনবাসি কৃষিকাজের ওপর নির্ভরশীল, কিন্তু বৃষ্টিপাতের অস্বাভাবিকতার জন্য, এমনকি নদী-বাঁধের ভাঙ্গনের কারণে এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে

সুন্দরবনের বাদাবন প্লাবিত হয়, নদীর নোনা জল সুন্দরবনবাসিকে স্বাভাবিক জীবন-যাপনের থেকে দূরে সরাতে বাধ্য করে। ফলে নানান সমস্যায় বির্বত সুন্দরবনবাসি। সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের প্রতিটি সম্পদই সুন্দরবনের ভারসাম্য বাজায় রাখে। ম্যানগ্রোভ অরণ্যকে সংরক্ষণ এবং ৩৫০০ কিলোমিটার নদীবাঁধকে রক্ষ্যা করতে পারলে তবেই সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য ঠিক থাকবে।

সুন্দরবন তথা সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের খ্যাতি আজ সারা বিশ্ববাসীর মুখে মুখে শ্রুত হচ্ছে। কিন্তু যত দিন অতিবাহিত হচ্ছে ততই সুন্দরবন তথা সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্র অবলুপ্তির পথে চলেছে। এর কারণও গবেষণা সন্দর্ভে আলোচিত হয়েছে। তাছাড়া বাস্তুতন্ত্রের প্রতিটি সম্পদই সুন্দরবনের ভারসাম্য বজায় রাখতে সক্ষম, কিন্তু মানুষের হস্তক্ষেপ ধ্বংস করছে সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের স্বাভাবিক পরিবেশ। ফলে সমগ্র বাস্তুতন্ত্র আজ বিপন্ন। এই স্বল্প পরিসরে সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রকে পর্যালোচনা করেছি আমার গবেষণার সন্দর্ভের সুবিধার্থে। একটা সময়ে সুন্দরবনের অরণ্যের প্রাণী সম্পদ ছিল প্রাইমারি উপাদান, আর মানুষ ছিল সেকেন্ডারি। বর্তমানে মানুষ হয়ে উঠেছে প্রাইমারি উপাদান। তাই সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের মানুষের সমস্যাই সব কিছুর ভারসাম্য বিঘ্নিত করছে। সুতরং মানুষের আর্থ-সামাজিক জীবনের সমাধানই হবে গভীর বাস্তুতন্ত্রের সমাধান। সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় সুন্দরবনবাসির সচেতনতার মধ্যেই এর সমাধান সম্ভব। সেকারণেই প্রতিটি জনগণকে বাস্তুতন্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন, গভীর বাস্তুতন্ত্রের মধ্যেকার যুব সমাজকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে, সুন্দরবনবাসির স্বাস্থ্যর প্রতি সচেতন হতে হবে, বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে, সর্বোপরি ম্যানগ্রোভ অরণ্য সম্পর্কে সচেতন না হলে সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রটাই ধ্বংস হয়ে যাবে। আর এসবের সমাধান তখনই সম্ভব হবে যখন সুন্দরবনের নদীবাঁধকে উন্নত

প্রযুক্তিতে সংরক্ষিত করতে পারা যাবে। এ সব কিছুর উপরে সরকারের একটা ইতিবাচক পদক্ষেপ কামনা করি, যাতে সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রসহ সুন্দরবনবাসির উন্নয়ন হয়।

গ্রন্থপুঞ্জীঃ

সহায়ক তথ্যসূত্র বাংলাঃ

১। দেবপ্রসাদ জানা (সম্পাদনা), শ্রীখণ্ড সুন্দরবন, দীপ প্রকাশন, প্রকাশক শংকর মন্ডল, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০০৪

২। কানাইলাল সরকার, সুন্দরবনের ইতিহাস, পাণ্ডুলিপি প্রকাশন, কলকাতা, প্রকাশক শুভেন্দু মিশ্র, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা, ২০১৭

৩। এ এফ এম আব্দুল জলিল, সুন্দরবনের ইতিহাস, আহমদ পাবলিশিং হাউস, প্রকাশক মেছ বাহাউদ্দীন আহমদ, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬, চতুর্থ মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৪

৪। এ এফ এম আব্দুল জলিল, সুন্দরবনের ইতিহাস, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, প্রকাশক পার্থশঙ্কর বসু, প্রথম ভারতীয় সংস্করণ, ২০০০

৫। পূর্ণেন্দু ঘোষ, ইতিহাসের আলোকে সুন্দরবন ও পোর্টক্যানিং, লোকসখা প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২৫ জানুয়ারি ২০১৭

৬। সুভাষ মিস্ত্রী, লোকায়ত সুন্দরবন, লোক প্রকাশন, সোনারপুর, কলকাতা, প্রকাশক রীণা সরকার, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা পুস্তক মেলা, ফেব্রুয়ারী ২০১৩

৭। সুভাষ মিস্ত্রী, সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ, পুস্তক বিপণি, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, প্রকাশক কুমকুম মাহিন্দার, প্রথম প্রকাশ, দোলপূর্ণিমা ১৪১৬, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১ লা অগ্রহায়ণ ১৪২৪

৮। কুমুদরঞ্জন নস্কর, ভারতের সুন্দরবন ও ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলকাতা, প্রকাশক পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, শ্রী গুণেন্দ্রনাথ মজুমদার, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ১৯৯৮

৯। সুধীন সেনগুপ্ত, সুন্দরবন জীব-পরিমন্ডল, আনন্দ পাবলিশার্স, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, প্রকাশক সুবীর কুমার মিত্র, প্রথম সংস্করণ, এপ্রিল ২০০৫, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০১২

১০। শশাঙ্ক মন্ডল, ব্রিটিশ রাজত্বে সুন্দরবন, পুনশ্চ প্রকাশন, কলকাতা, প্রকাশক সন্দীপ নায়ক, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯৫, পরিমার্জিত সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৭

১১। বিশ্বজিৎ রায়চৌধুরী, সুন্দরবন, নান্দনিক প্রকাশন, টেমার লেন কলকাতা, প্রকাশক সঞ্জয় ভদ্র, প্রথম প্রকাশ জুন ২০১৪

১২। বিকাশকান্তি সাহা, সুন্দরবন কথা, দে পাবলিকেশনস্, কোলকাতা, প্রকাশক দীপক দে, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৬

১৩। সুরেশ কুন্ডু, সুন্দরবন অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ, নান্দনিক পাবলিকেশন, টেমার লেন, কলকাতা,প্রকাশক সঞ্জয় ভদ্র, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৯

১৪। অনুকূল মণ্ডল, সুন্দরবনের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি, দি সী বুক এজেন্সী, মুক্তারামবাবু স্ট্রিট, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, পুণ্য রথযাত্রা, ১৪২১, জুলাই ২০১৪

১৫। তুষার কাঞ্জিলাল, সুন্দরবনের সাতকাহন, কৃতি, ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা, প্রকাশক স্বপ্না সাউ, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৯

১৬। প্রণব সরকার (সম্পাদনা), চব্বিশ পরগনা ও সুন্দরবন পুরনো ও দুষ্প্রাপ্য রচনা, লোক প্রকাশন, সোনারপুর, কলকাতা, প্রকাশক রীনা সরকার, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা ২০১৩

১৭। শঙ্করকুমার প্রামাণিক, সুন্দরবন জল-জঙ্গল-জীবন, সাহিত্য প্রকাশ, জেমস লঙ্ সরণি কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৪ এপ্রিল ২০০৮, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২৫ ডিসেম্বর ২০১৪

১৮। সুকুমার সিং, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ইতিহাস (একখন্ডে), মাস এন্টার্‌টেন্‌মেন্ট্ প্রাইভেট লিমিটেড, গড়িয়া, কলকাতা, প্রকাশক মাস এন্টার্‌টেন্‌মেন্ট্ প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, প্রথম খন্ড, ২৫ অক্টোবর, ১৯৯৫, দ্বিতীয় সংস্করণ, একখণ্ডে, কলকাতা পুস্তকমেলা-২০১০

১৯। সুকুমার সিং, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড), মাস এন্টার্‌টেন্‌মেন্ট্ প্রাইভেট লিমিটেড, গড়িয়া, কলকাতা, প্রকাশক মাস এন্টার্‌টেন্‌মেন্ট্ প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, দ্বিতীয় খন্ড, ১২ই এপ্রিল, ১৯৯৬

২০। ইন্দ্রাণী ঘোষাল, সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের জীবন, তাদের লোকসংস্কৃতি এবং লোকসাহিত্য, পুস্তক বিপণি, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, প্রকাশক সলীল ঘোষাল, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ২০০৬

২১। মহাদেব গুড়িয়া, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা সমগ্র, পাণ্ডুলিপি প্রকাশন, কলকাতা, প্রকাশক শুভেন্দু মিশ্র, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা ২০১৩

২২। রঞ্জন চক্রবর্তী ও ইন্দ্র কুমার মিস্ত্রী, সুন্দরবনের অর্থনীতি জনসংস্কৃতি ও পরিবেশ, রিসা রির্ভাস সার্ভিস, কলকাতা, প্রকাশক তন্দ্রিতা চন্দ্র (ভাদুড়ি), প্রথম প্রকাশ, ২৩ জানুয়ারি, ২০০৭

২৩। কৃষ্ণকালী মণ্ডল, দক্ষিণ চব্বিশপরগনার বিস্মিত অধ্যায়, নব চলন্তিকা, কলকাতা, প্রকাশিকা শ্রীমতী মল্লিকা মণ্ডল ও শ্রীমতী মিঠু মণ্ডল, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা, জানুয়ারী,১৯৯৯

২৪। কমল চৌধুরী, চব্বিশ পরগণা উত্তর দক্ষিণ সুন্দরবন, দে'জ পাবলিশিং, প্রকাশক সুভাষ চন্দ্র দে, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ১৯৯৯, অগ্রহায়ণ ১৪০৬

২৫। গোকুল চন্দ্র দাস, চব্বিশ পরগণার আঞ্চলিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা, প্রকাশক শ্রী কমল মিত্র, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর, ২০০৪

২৬। অমিতাভ ঘোষ, ভাটির দেশ, অনুবাদ অচিন্ত্যরূপ রায়, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রকাশক সুবীরকুমার মিত্র, প্রথম সংস্করণ, নভেম্বর ২০০৯, চতুর্থ মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ২০১৬

২৭। শঙ্করকুমার প্রামাণিক, সুন্দরবন জনজীবন কাঁকড়ামারা মাছধরা আর মৌলে, গাঙচিল, কলকাতা, প্রকাশক অনিমা বিশ্বাস, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৭

২৮। মলয় দাস, সুন্দরবনের জনজীবন ও সংস্কৃতি, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, প্রকাশক নারায়ন চন্দ্র ঘোষ, প্রথম প্রকাশ, ১৫ এপ্রিল ২০১১

২৯। রাজিব আহমেদ (সম্পাদিত), সুন্দরবনের ইতিহাস (প্রথম খন্ড), গতিধারা প্রকাশন, ঢাকা, প্রকাশক শিকদার আবুল বাশার, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১২

৩০। রাজিব আহমেদ (সম্পাদিত), সুন্দরবনের ইতিহাস (দ্বিতীয় খন্ড), গতিধারা প্রকাশন, ঢাকা, প্রকাশক শিকদার আবুল বাশার, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১২

৩১। অঞ্জলি বিকাশ মণ্ডল, সুন্দরবন সেকাল-একাল, রূপকথা, কলকাতা, প্রকাশক কাবেরী মণ্ডল, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ২০১১

৩২। সুভাষ মিস্ত্রী, দক্ষিণবঙ্গের লোক সমাজে মন্ত্র, লোক প্রকাশন, কলকাতা, প্রকাশক রীনা সরকার, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০০০, দ্বিতীয় প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১৩

৩৩। কুমুদ রঞ্জন নস্কর, নিম্ন গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চলের জীব বৈচিত্র্য, বঙ্গীয় ভূগোল মঞ্চ, কলকাতা, প্রকাশক বঙ্গীয় ভূগোল মঞ্চ, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৩, দ্বিতীয় প্রকাশ অক্টোবর ২০১৬

৩৪। শচীন দাশ, জল জঙ্গল ও জনজীবনে সুন্দরবন, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, প্রকাশক শঙ্কর মণ্ডল, প্রথম সংস্করণ, বইমেলা জানুয়ারি ১৯৯৭

৩৫। সতীশচন্দ্র মিত্র, যশোহর খুলনার ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড), দাশগুপ্ত এন্ড কোম্পানী, প্রকাশক শিবশঙ্কর মিত্র, প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯২২, দ্বিতীয় সংস্করণ জুন ১৯৬৫

৩৬। ডঃ সুশীল ভট্টাচার্য, চব্বিশ পরগনার আঞ্চলিক ইতিহাস, দক্ষিণী প্রকাশন, বারুইপুর, প্রকাশক কৃষ্ণকলি মুৎসুদ্দি, প্রথম প্রকাশ, ১৪ই নভেম্বর ২০০৪

৩৭। সুকুমার সিং ও আশিস কান্তি ভট্টাচার্য, সুন্দরবনঃ দারিদ্র্য ও বঞ্চনার সমীক্ষা, মালাট বুক এজেন্সী, মহামায়াতলা, গড়িয়া, প্রকাশিকা শ্রীমতী শীলা সিং, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২

৩৮। কুমুদরঞ্জন নস্কর, প্রকৃতির প্রতিশোধ-সুন্দরবন, গাঙচিল, কলকাতা, প্রকাশক অনিমা বিশ্বাস, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৬

৩৯। কল্যাণ চক্রবর্তী, মানুষ ও বাঘ, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রকাশক দ্বীজেন্দ্রনাথ বসু, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ১৯৮৮, দ্বিতীয় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২

৪০। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, প্রকাশক সুধাংশু শেখর দে, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ১৯৭৭, ষষ্ঠ সংস্করণ, আগস্ট ২০০৪

৪১। বরেন্দু মণ্ডল, সুন্দরবন ও আমাদের কথা, গাঙচিল, প্রকাশক অনিমা বিশ্বাস, প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ২০১৫

৪২। কালিদাস দত্ত, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার অতীত, প্রথম খন্ড, সুন্দরবন সংগ্রহশালা, বারুইপুর, প্রকাশক মানস মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ, মার্চ ১৯৮৯

৪৩। মোঃ মোশারফ হোসেন, সুন্দরবন বৈচিত্র্যের অপর নাম, দিব্যপ্রকাশ, প্রকাশক দিব্যপ্রকাশ, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৬, দ্বিতীয় প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৯

৪৪। মায়া বাসন্তী, সুন্দরবন স্বাধীনতার আগে ও পরে, জোনাকি পাবলিশার্স, প্রকাশক হরিপদ গায়েন, প্রথম প্রকাশ ২৫শে বৈশাখ ১৪২৩

৪৫। শঙ্করকুমার প্রামাণিক, সুন্দরবনের কাঁকড়ামারা, বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, প্রকাশক ডঃ প্রিয়াঙ্কা মাজী, প্রথম প্রকাশ ২৬ জানুয়ারি ২০১৪

৪৬। কৃষ্ণকালি মণ্ডল, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার পুরাকথা, অনিমা ভবন, বারুইপুর, প্রকাশিকা শ্রীমতী মল্লিকা মণ্ডল ও শ্রীমতী মিঠু মণ্ডল, প্রথম প্রকাশ, ১লা নভেম্বর, ২০১৩

৪৭। ধূর্জটি লশকর, বাদাবনের বংশধর, দেবলা প্রকাশনী, প্রকাশক অভিজ্ঞান নস্কর, প্রথম প্রকাশ ২৬শে জানুয়ারি, ২০১৬

৪৮। সন্তোষ কুমার বর্মন, আদি সুন্দরবনের ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি (লোনা মাটির মিঠেকথা), পাণ্ডুলিপি কলকাতা, প্রকাশক শুভেন্দু মিশ্র, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর ২০১৩

৪৯। তুষার কাঞ্জিলাল, সুন্দরবনের গপ্পোসপ্পো, আজকাল প্রকাশন, প্রকাশক জ্যোতিপ্রকাশ খান, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪২২, জানুয়ারি ২০১৬, দ্বিতীয় প্রকাশ, বৈশাখ ১৪২৩, এপ্রিল ২০১৬

৫০। সুকুমার মিত্র, সুন্দরবনের ভাঙ্গাগড়া, জনসংহতি কেন্দ্র, প্রকাশক জনসংহতি কেন্দ্র, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ১৯৯৬

৫১। জ্যোতিরিন্দ্র নারায়ন লাহিড়ী, সুন্দরবন অনাধিকার চর্চা, রংরুট হলিডেইয়ার প্রকাশনা, প্রকাশক প্রদোষ রঞ্জন সাহা, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা, জানুয়ারি ২০১৫

৫২। ডঃ মণীন্দ্রনাথ জানা, সুন্দরবনের সমাজ ও সংস্কৃতি, দীপালি বুক হাউস, প্রকাশক দীপালি বুক হাউস, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৮৪

৫৩। স্বপন কুমার মণ্ডল, সুন্দরবন, কথা প্রকাশন, প্রকাশক কথা, প্রথম প্রকাশ ১৪১৭, ২০১১, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৪২৩,২০১৬

৫৪। বরেন্দু মণ্ডল, সুন্দরবনের স্মৃতি, গাঙচিল, প্রকাশক অনিমা বিশ্বাস, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর ২০১৫,

৫৫। শেখ সামসুদ্দিন, অশনিগ্রাসে বৈচিত্র্যময় সুন্দরবন, উবুদশ, প্রকাশক সিদ্ধার্থ রঞ্জন চৌধুরি, প্রথম প্রকাশ, ২৫ জানুয়ারি ২০১২ (বইমেলা)

৫৬। মিতা সিংহ, বাঘ কুমীর সুন্দরবন, নিউস্ক্রিপ্ট, প্রকাশক অমিতানন্দ দাশ, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৬

৫৭। তন্ময় চৌধুরী ও জ্যোতিরিন্দ্র নারায়ন লাহিড়ী (সম্পাদিত), সুন্দরবন, অযান্ত্রিক, প্রকাশক অযান্ত্রিক, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা ২০১৪

৫৮। তুষার কাঞ্জিলাল, জল জঙ্গলের কথা, ক্যাম্প, প্রকাশক অচিন্ত্য গুপ্ত, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৯৩

৫৯। সুকুমার সিং, সুন্দরবনের ইতিকথা ও অ-সরকারি উন্নয়ন সংখ্যা, মাস এডুকেশন প্রকাশনা, প্রকাশক মাস এডুকেশন, প্রথম প্রকাশ, বনবিবি উৎসব- গোসাবা, ২রা জানুয়ারি ২০০২

৬০। সাগর চট্টোপাধ্যায়, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার পুরাকীর্তি, প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহালয় অধিকার, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা, ২০০৫

৬১। ডঃ অরুন কুমার দাশ, সুন্দরবন, বাণী বুক এজেন্সী, প্রকাশক শ্রী গোপাল ঘোষ, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪০৯

৬২। সৌমেন দত্ত, প্রেক্ষাপট সুন্দরবন, আজকাল, প্রকাশক জ্যোতিপ্রকাশ খান, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪১৬, জানুয়ারি ২০১০

৬৩। কানাইলাল সরকার, সুন্দরবনের ইতিহাস, রূপকথা প্রকাশন, প্রকাশক কাবেরী মণ্ডল, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১১

৬৪। বিনোদ বেরা, সুন্দরবনের সুখ-দুঃখ, গ্রামীন শিল্প উন্নয়ন সংস্থা, প্রকাশক প্রকৃতি রায়, প্রথম প্রকাশ, বনবিবি উৎসব- কৈখালী, ১৬ই ফাল্গুন ১৪০৯, ১লা মার্চ ২০০৩

৬৫। অভিজিৎ সেনগুপ্ত, সুন্দরবনের ডায়েরি, চর্চাপদ, প্রকাশক বিশ্বদীপ ঘোষ, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০১০

৬৬। শিবশঙ্কর মিত্র, সুন্দরবন সমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রকাশক দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ১৯৮৮

৬৭। রথীন্দ্রনাথ দে, সুন্দরবন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, প্রকাশক পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ১৯৯১

৬৮। সন্তোষ বর্মন (সম্পাদনা), দ্বীপের নাম সাতজেলিয়া, রূপকথা, প্রকাশক রূপকথা, প্রথম প্রকাশ, সোনারপুর বইমেলা, ডিসেম্বর ২০১৩

৬৯। ধূর্জটি নস্কর, সুন্দরবনের লোকায়ত দর্পন, শ্যামলী পাবলিকেশন, প্রকাশক গৌর অধিকারী, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯৭

৭০। নির্মলকান্তি ঘোষ, সুন্দরবন, লক্ষ্মীনারায়ন বুক ডিপো, প্রকাশক শ্রী পরিতোষ বিশ্বাস, প্রথম প্রকাশ, ১লা বৈশাখ ১৩৮৭, ১১ই এপ্রিল ১৯৮০

৭১। সুকুমার সিং, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ইতিহাস - জীবন জীবিকার কাহিনী (দ্বিতীয় খন্ড), মাল্টি বুক এজেন্সী, প্রকাশিকা শীলা সিং, প্রথম প্রকাশ, ১২ই এপ্রিল ১৯৯৬

৭২। শেখ রেজওয়ানুর ইসলাম, সুন্দরবনের প্রান্তিক জীবন ও ঐতিহ্য, সমকালের জিয়নকাঠি প্রকাশনা, প্রকাশক নাজিবুল ইসলাম মন্ডল, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০১৩

৭৩। গৌরাঙ্গ চক্রবর্তী, কাকদ্বীপে তেভাগার লড়াই, সেরিবান, প্রকাশক গৌতম মিত্র, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০০৪

৭৪। কৃষ্ণকালী মন্ডল, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা আঞ্চলিক ইতিহাসের উপকরণ, নবচলন্তিকা, প্রথম প্রকাশক, শ্রীমতী মল্লিকা মন্ডল, মিঠু মন্ডল, দ্বিতীয় প্রকাশক, ডঃ হিমাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ, শুভ দোলযাত্রা, ১০ই চৈত্র, ১৪০৩, ২৪শে মার্চ ১৯৯৭, দ্বিতীয় প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০১

৭৫। মহাম্মদ আব্দুল বাতেল, সুন্দরবনের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও বনজীবি মানুষের কথা, অনিন্দ্য প্রকাশ, প্রকাশক আফজন হোসেন, প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র ১৪২১, সেপ্টেম্বর ২০১৪

৭৬। বিমলেন্দু হালদার, দক্ষিণবঙ্গ জনসংস্কৃতি ভাষা ও ইতিহাস বিচিত্রা (প্রথম খণ্ড), চতুর্থ দুনিয়া, প্রকাশক ঊষারঞ্জন মজুমদার, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা জানুয়ারি ২০০১

৭৭। অসীম কুমার মান্না, দক্ষিণবঙ্গের লোকায়ত সংস্কৃতি, লোকসখা প্রকাশন, প্রকাশক মৃত্যুঞ্জয় সেন, প্রথম প্রকাশ, ২৬শে জানুয়ারি ২০১১, ১১ই মাঘ ১৪১৭

৭৮। শশধর চক্রবর্তী, বিস্ময়ে ভরা সুন্দরবন, চক্রবর্তী প্রকাশন, প্রকাশক চক্রবর্তী প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, বারাসাত, ১৯৯৮

৭৯। মনোরঞ্জন রায়, পরায়ত্ত পরগনা কথা চব্বিশ পরগনা জেলার ইতিহাস (দ্বিতীয় খন্ড), ইউনিভারসাল গ্রাফিক্স, প্রকাশক শ্রীমতী সতী রায়, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ১৯৯৩

৮০। সন্তোষ বর্মন (সম্পাদনা), স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিলটন ও গোসাবা, কথা প্রকাশন, প্রকাশক কথা, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০১২

৮১। শশাঙ্ক শেখর দাস, বনবিবি, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পঃ সঃ, প্রকাশক প্রদীপ ঘোষ, প্রথম প্রকাশ, মার্চ ২০০৪

৮২। সুজিত কুমার সেনগুপ্ত, সুন্দরবনের শয়তান, নিউ বেঙ্গল প্রেস, প্রকাশক শ্রী প্রবীর কুমার মজুমদার, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৯৯

৮৩। তাহাওয়ার আলি খান, সুন্দরবনের নরখাদক, অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির, প্রকাশক অমিয় কুমার চক্রবর্তী, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৬৮

৮৪। বিশ্বনাথ বসু, অভিশপ্ত সুন্দরবন, অরুনা প্রকাশনী, প্রকাশক বিভাস চন্দ্র বাগচী, প্রথম প্রকাশ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৬

৮৫। শেখ সামসুদ্দিন, বৈচিত্র্যময় সুন্দরবন, বিজয়ায়ন, প্রকাশক আবদুল হান্নান, প্রথম প্রকাশ, শারদীয়, ২০০৮

৮৬। মনোরঞ্জন পুরকাইত, আমার বাড়ি সোঁদরবনে, গ্রন্থমিত্র, প্রকাশক বিদিশা পুরকাইত, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা ২০০১

৮৭। ত. ইসলাম, সুন্দরবনের কথা, বিদ্যাপ্রকাশ, প্রকাশক মজিবর রহমান খোকা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৮

৮৮। প্রদীপ কুমার বর্মন, বাঘের রাজত্বে, সমকালের জিয়নকাঠি প্রকাশনা, প্রকাশক নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০১২

৮৯। বুদ্ধদেব গুহ, বনবিবির বনে, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রকাশক দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ১৯৭৯, পঞ্চম সংস্করণ, অক্টোবর ১৯৯৫

৯০। শিবশঙ্কর মিত্র, সুন্দরবনে আর্জান সর্দার, দীপায়ন, প্রকাশিকা রেনু দেবী, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৬২, দ্বিতীয় প্রকাশ, চৈত্র ১৩৬৩

সহায়ক তথ্যসূত্র ইংরেজীঃ

1. Sutapa Chatterjee sarkar, The Sundarbans Folk Deities, Monsters and Mortals, Social Science Press, Jor Bagh, New Delhi, Esha Beteille, 2010

2. D.N. Guha Bakshi, P. Sanyal, and K.R. Naskar, Sundarbans Mangal, Naya Prokash, Bidhan Sarani, Calcutta, Publisher Naya Prokash, First Published, 3rd June, 1999

3. Tanmay Choudhury, The Sundarbans, The Hinterland of Wilderness, Publisher Biswadip Ghosh, First Published, Kolkata, 2011

4. Amit Bhattacharyya, Mahua Sarkar (Edited), History And The Changing Horizon, Science, Environment, and Social System, Setu Prakashani, Kolkata, Publisher Archana Das and Subrata Das, First Published, September 2014.

5. Nirban Basu, Mahua Sarkar, Sutapa Ghosh Dastidar, Reflections on Postcolonial Bengal: Society, Economy and Polity, Department nof history, Barrackpore Rastraguru Surendranath College.

প্রাথমিক তথ্যসূত্র ইংরেজীঃ

1. Annual Progress Report of Forest Administration for 1868-1869, Calcutta, 1869

2. Ascoli, F.D. – *A Revenue History of the Sundarbans (1870-1920)* Calcutta, 1921, The Bengal Secretariat Book Depot.

3. Hunter, W.W. – *A Statistical Account of Bengal – 24 Parganas and Sundarbans – Vol 1*, Trubner and Company, London, 1875.
4. Hunter, W.W. – *The Imperial Gazetteer of Bengal*: 1903 1904.

5. O'Malley, L.S.S. – *Eastern Bengal District Gazetteer: 24 Paraganas*, Calcutta, 1914

পত্রপত্রিকাঃ

১। নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল (সম্পাদক), সুন্দরবনঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা – ১, সমকালের জিয়নকাঠি, প্রথম প্রকাশ, জুলাই – ডিসেম্বর -২০১৫

২। নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল (সম্পাদক), সুন্দরবনঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা-২, সমকালের জিয়নকাঠি, প্রথম প্রকাশ, জুলাই – ডিসেম্বর -২০১৬

৩। নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল (সম্পদক), সুন্দরবন কথাসাহিত্য বিশেষ সংখ্যা, সমকালের জিয়নকাঠি, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১১.

৪। তাপস ভৌমিক (সম্পাদক), কোরক সাহিত্য পত্রিকা, সুন্দরবন সংখ্যা, প্রকাশক সৈয়দ মুজতবা আলি.

৫। কেমন আছে সুন্দরবনের মানুষ, আয়লা পরবর্তী একটি সমীক্ষা, প্রকাশক মন্থন সাময়িকী, প্রকাশ কাল, নভেম্বর ২০১০.

৬। নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল (সম্পাদক), সুন্দরবন বিশেষ সংখ্যা, দ্বিতীয় খণ্ড, সমকালের জিয়নকাঠি, নবম বর্ষ, যুগ্ম সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৮.

৭। পর্যটন সংখ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, ২৮ সেপ্টেম্বর- ১৯ অক্টোবর ২০০১, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ.

৮। প্রনব সরকার (সম্পাদনা), স্বদেশচর্চা, অরণ্য ও আরণ্যক, বইমেলা-২০১৫.

৯। পশ্চিমবঙ্গ, জেলা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৪০৬.

১০। নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল (সম্পাদনা), সুন্দরবন লোকসংস্কৃতি, বিশেষ সংখ্যা, প্রথম খণ্ড, সমকালের জিয়নকাঠি, একাদশ বর্ষ, জুন ২০১০.

১১। নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল (সম্পাদনা), সুন্দরবন লোকসংস্কৃতি, বিশেষ সংখ্যা, দ্বিতীয় খণ্ড, সমকালের জিয়নকাঠি, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১২.

১২। জ্যোতিরিন্দ্র নারায়ণ লাহিড়ী (সম্পাদক), শুধু সুন্দরবন চর্চা, দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, প্রকাশনা, সমীরণ ঘোষ, ১৫ই জানুয়ারী ২০১.৪

১৩। জ্যোতিরিন্দ্র নারায়ণ লাহিড়ী (সম্পাদক), শুধু সুন্দরবন চর্চা, তৃতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, প্রকাশণা, সমীরণ ঘোষ, ১৫ এপ্রিল, ২০১৫.

১৪। জ্যোতিরিন্দ্র নারায়ণ লাহিড়ী (সম্পাদক), শুধু সুন্দরবন চর্চা, তৃতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, প্রকাশনা, সমীরণ ঘোষ, ১৫ই জুলাই, ২০১৫.

১৫। জ্যোতিরিন্দ্র নারায়ণ লাহিড়ী (সম্পাদক), শুধু সুন্দরবন চর্চা, চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, প্রকাশনা, সমীরণ ঘোষ, ১৫ই জানুয়ারী ২০১৬.

১৬। জ্যোতিরিন্দ্র নারায়ণ লাহিড়ী (সম্পাদক), শুধু সুন্দরবন চর্চা, চতুর্থ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, প্রকাশনা, সমীরণ ঘোষ, ১৫ই জুলাই ২০১৬.

১৭। জ্যোতিরিন্দ্র নারায়ণ লাহিড়ী (সম্পাদক), শুধু সুন্দরবন চর্চা, পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, প্রকাশনা, সমীরণ ঘোষ, ১৫ই অক্টোবর, ২০১৬.

১৮। জ্যোতিরিন্দ্র নারায়ণ লাহিড়ী (সম্পাদক), শুধু সুন্দরবন চর্চা, পঞ্চম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, প্রকাশনা, সমীরণ ঘোষ, ১৫ই জানুয়ারী, ২০১৭.

১৯। জ্যোতিরিন্দ্র নারায়ণ লাহিড়ী (সম্পাদক), শুধু সুন্দরবন চর্চা, পঞ্চম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, প্রকাশন, সমীরণ ঘোষ, ১৫ই জুলাই ২০১৭.

২০। জ্যোতিরিন্দ্র নারকায়ণ লাহিড়ী (সম্পাদক), শুধু সুন্দরবন চর্চা, ষষ্ঠ বর্ষ, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা, প্রকাশনা, সমীরণ ঘোষ, ১৫ই অক্টোবর ২০১৭ ও ১৫ই জানুয়ারী ২০১৮.

২১। জ্যোতিরিন্দ্র নারায়ণ লাহিড়ী (সম্পাদক), শুধু সুন্দরবন চর্চা, প্রকাশনা, সমীরণ ঘোষ, জানুয়ারী ২০১৯.

সাক্ষাৎকারঃ

১। বিশাখা বেরা, বয়স- ৬০ বছর, গোসাবা, পাঠানখালি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পেশা- নদীতে মাছ ধরা, তারিখ- ০৭-০৩-২০১৯, সময়- ১টা ৫০মিনট.

২। কবিতা ঘোড়ই, বয়স-৫৪ বছর, গোসাবা, পাঠানখালি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পেশা- নদীতে মাছ ধরা, তারিখ- ০৭-০৩-২০১৯, সময়- ৩টা ২০মিনিট.

৩। নূপুর হাজরা, বয়স-৫০ বছর, উত্তর সুরেন্দ্র গঞ্জ, দাসপুর, পাথর প্রতিমা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পেশা- একশো দিনের শ্রমিক, তারিখ-২২-০৩-২০১৯, সময়- সকাল ১০টা ২০মিনিট.

৪। তপন মাইতি, বয়স- ৩৭ বছর, পেশা- মৎস্যজীবী, গোবর্ধনপুর, ইন্দ্রপুর, পাথর প্রতিমা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, তারিখ- ২২-০৩-২০১৯, সময়- বিকেল ৩টে ৫৪মিনিট.

৫। আশিষ কুমার বর্মণ, বয়স- ৬৮ বছর, পেশা- শিক্ষকতা, উত্তর সুরেন্দ্র গঞ্জ, দাসপুর, পাথর প্রতিমা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, তারিখ- ২৩-০৩-২০১৯, সময়- রাত্রি ৭টা ৩০মিনিট.

৬। শুকদেব দোলুই, বয়স- ৭০ বছর, পেশা- শ্রমজীবী, গোবিন্দপুর, রাক্ষসখালি, পাথর প্রতিমা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, তারিখ- ২৪-০৩-২০১৯, সময়- ৯টা ৫২মিনিট.

৭। গীতা দোলুই, বয়স- ৫৩ বছর, পেশা- নদীতে মীন ধরা, ছয় মাইল, নামখানা, বকখালি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, তারিখ- ১৮-০৪-২০১৯, সময়- ১১টা ৪৫মিনিট.

৮। নারায়ণ ভুঁইয়া, বয়স- ৬১ বছর, পেশা- শ্রমিক, ভগবতপুর, পাথর প্রতিমা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, তারিখ- ২৭-০৪-২০১৯, সকাল- ৯টা ১০মিনিট.

৯। শ্রীমন্ত দিন্ডা, বয়স- ৫০ বছর, পেশা- ব্যবসায়ী, সত্যদাসপুর, কৃষ্ণদাসপুর, পাথর প্রতিমা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, তারিখ-০৯-০৪-২০১৯, সময়- ২টা ৪০মিনিট.

১০। শ্রী প্রভাত মাজী, বয়স- ৬৬ বছর, পেশা- কৃষিকাজ, কামদেবনগর, দূর্বাচটি, পাথর প্রতিমা, দক্ষিণ ২৪ পরগানা, তারিখ- ০৭-০৩-২০১৯, সময়- সকাল ১১টা ২৫মিনিট.

১১। বিশ্বজিৎ প্রধান, বয়স- ৪৭ বছর, পেশা- কৃষিজীবী, কামদেবনগর, দূর্বাচটি, পাথর প্রতিমা, দক্ষিণ ২৪ পরগানা, তারিখ- ০৭-০৩-২০১৯, সময়- ১টা ১০মিনিট.

১২। মহাদেব দোলুই, বয়স-৪৮ বছর, পেশা- মৎস্যজীবী, গোবিন্দপুর, রাক্ষসখালি, পাথর প্রতিমা, দক্ষিণ ২৪ পরগানা, তারিখ- ২৪-০৩-২০১৯, সময়- ১২টা ৩৫মিনিট.

১৩। বাদল দাস, বয়স- ৫০ বছর, পেশা- মৎস্যজীবী, গোবিন্দপুর, রাক্ষসখালি, পাথর প্রতিমা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, তারিখ- ২৪-০৩-২০১৯, সময়- বিকেল ৪টা ৪০মিনিট.

১৪। গৌরি দাস, বয়স- ৫৫ বছর, পেশা- নদীতে মীন ধরা, দুর্গাগোবিন্দপুর, এম দুর্গাগোবিন্দপুর, পাথর প্রতিমা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, তারিখ- ১৩-০৪-২০১৯, সময়- বিকাল ৩টা ২০মিনিট.

১৫। মানস দাস, বয়স- ৪০ বছর, পেশা- মৎস্যজীবী, দুর্গাগোবিন্দপুর, এম দুর্গাগোবিন্দপুর, পাথর প্রতিমা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, তারিখ-১৩-০৪-২০১৯, সময়- বিকাল ৫টা ১৭মিনিট.

১৬। হরিপদ দাস, বয়স- ৭০ বছর, পেশা- মৎস্যজীবী, শিবনগর, বনশ্যামনগর, পাথর প্রতিমা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, তারিখ- ০৯-০২-২০১৯, সময়- ১০টা ২৫মিনিট.

পরিশিষ্টঃ

সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল

সুন্দরবনের নদীচরে বৃক্ষ রোপণ

সুন্দরবনের মাছ ঘেরির বাস্তুতন্ত্র

সুন্দরবনবাসীর মীন শিকার

গঙ্গা স্নান

সুন্দরবনের বড়কাছারি মন্দিরের মেলা

নৌকা মেরামতির প্রক্রিয়া

সুন্দরবনের বিদ্যাধরী নদীর চর

সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের ট্রলার

সুন্দরবনের নদীর উপর দিয়ে বিদ্যুৎ পারাপার

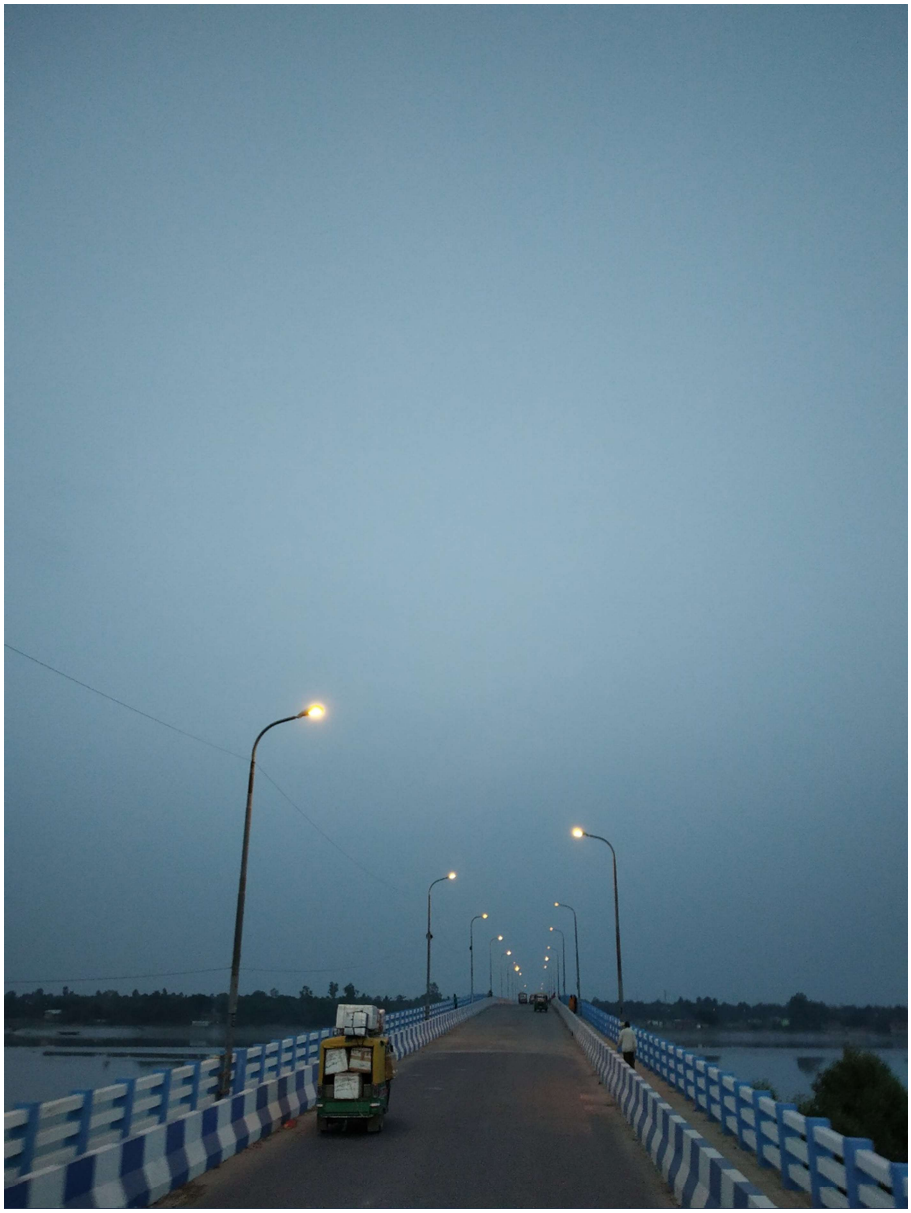

সুন্দরবনের প্রবেশ দ্বার ক্যানিং ব্রিজ